সালাফী হও সত্যিকারের

كن سلفيا على الجادة

মূল আরবী ঃ
ফযীলাতুল উস্তায ডক্টর
আব্দুস সালাম বিন সালেম আস-সুহাইমী
শরীয়া বিভাগের অধ্যাপক, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়

অনুবাদ ঃ
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

বক্ষমাণ পুস্তিকার আরবী নাম 'কুন সালাফিয়্যান আলাল জা-দ্দাহ'।

নামটি বড় অর্থবহুল। এর অর্থ হয় ঃ-

রাজপথের সালাফী হও।

অনেকে সালাফিয়াতের উপপথ, শাখাপথ, কাঁচাপথ ধরে চলছে। তুমি পাকা রাস্তার প্রধান পথের চলমান সালাফী হও। লোকাল সড়কের পথিক না হয়ে জাতীয় সড়ক বা হাই-ওয়ের পথিক হও।

প্রকৃতপক্ষে সালাফী হও।

অনেকে সালাফী থেকেও অন্য পক্ষে থাকে। এ দলে থাকে, সে দলের পক্ষেও বলে। অন্য মানহাজকেও সমর্থন করে। অন্য জামাআতেরও পক্ষপাতিত্ব করে। অনেকে নিরপেক্ষ থাকে। তুমি প্রকৃতপক্ষে সালাফী হয়ে থাকো।

প্রকৃতার্থে সালাফী হও।

অনেকে অনেক অর্থে 'সালাফী' হয়ে আমল করছে, চাকরি করছে। তুমি প্রকৃতভাবে 'সালাফী' হয়ে আমল কর।

সঠিকার্থে সালাফী হও।

অনেক বেঠিক অর্থে সালাফী হয়েছে, ভুল অর্থে সালাফী রয়েছে, বিকৃত অর্থে সালাফী আছে। তুমি সালাফী হও সঠিকার্থে।

সত্যিকার বা সত্যিকারের সালাফী হও।

অনেকে মিথ্যাকার সালাফী সেজেছে। অনেকে সালাফিয়াতের অর্থে মিথ্যা ও অসত্য। তুমি হও সত্যিকারের সালাফী।

আসল সালাফী হও। অনেকে নকল সালাফী রয়েছে। তুমি হও আসলি সালাফী। লেবেল লাগিয়ে সালাফী হয়ো না।

খাঁটি সালাফী হও।

অনেকে ভেজালমার্কা সালাফী রয়েছে। তুমি হও নির্ভেজাল খাঁটি ও বিশুদ্ধ সালাফী। যে সালাফিয়াতের মাঝে অন্য কোন মানহাজের সংমিশ্রণ নেই। অন্য কোন আকীদার ভেজাল নেই। অন্য কোন অসালাফী আমল মিশানো নেই।

অকপট সালাফী হও।

কপট বা (আমলগত) মুনাফিক সালাফী হয়ো না। কথায় সালাফী, কিন্তু কাজে খালাফী-ওয়ালা অথবা কথা ও কাজে সালাফী, কিন্তু আকীদায় বিদআতী-ওয়ালা সালাফী হয়ো না। দো-টানায় দোদুল্যমান সালাফী হয়ো না। দু-দলের মন রক্ষাকারী সালাফী হয়ো না।

সাচ্চা সালাফী হও।

তোমার মাঝে যেন মিথ্যাচারিতা, দ্বিচারিতা, বহুচারিতা না থাকে।

অকৃত্রিম সালাফী হও।

তোমার মাঝে যেন মেকি-ফাঁকি না থাকে। তোমার মাঝে যেন লোকপ্রদর্শনকারী সালাফিয়াত না থাকে। অভিনীত বা সাজানো সালাফিয়াত না থাকে। তুমি যেন চাকরি বা পেটের দায়ে সেজে থাকা সালাফী না হও।

সত্যনিষ্ঠ সালাফী হও।

তুমি নিজেকে 'সালাফী' বলে পরিচয় দিতে ভয় করো না, লজ্জা পেয়ো না। নিজেকে কোন স্বার্থে গোপন করো না। ছুপা রুস্তম হয়ো না।

সর্বাংশে সালাফী হও।

দ্বীনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্ব অংশে সালাফী হও। আকীদা, মানহাজ, আমল-ইবাদত, দাওয়াত-তবলীগ, আখলাক-চরিত্র এবং আচার-ব্যবহারে তুমি 'সালাফী হও সত্যিকারের'।

হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চলমান। সালাফী ও খালাফীদের লড়াইও বর্তমান। খালাফী বা অসালাফী মানুষ নানা সময়ে সালাফী নিয়ে উপহাস করে, গালাগালি করে, কটাক্ষ করে, জাহেল ধারণা করে, সত্য গোপন-সহ আরো কত শত অপবাদ দেয়, এটাতে তত গায়ে লাগে না। কারণ এটা অস্বাভাবিক নয়। তাদেরকে বুঝালে তারা যে ফিরে আসবে তার আশাও নিতান্ত কম। যারা প্রকৃত সালাফী, তারা যে, খালাফী হয়ে যাবে, তারও আশঙ্কা নেহাতই অল্প। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যারা মাঝামাঝি আকীদার। যারা এখনো দোটানায় দোদুল্যমান, যারা সালাফী ঘরে জন্ম নিয়েও এখনো খাঁটি সালাফী হতে পারেনি অথবা বাইরের অন্য পরিবেশের চাপে

খালাফী দলে ভিড়ে গেছে, অথচ নিজের শিকড়ও ছিঁড়তে পারছে না অথবা কোন মুক্তমনের খালাফী সালাফী পরিবেশ পেয়ে সালাফিয়াতকে সাদরে বরণ করতে পারছে না অথবা সালাফী পরিবেশে গিয়ে সালাফী এবং খালাফী পরিবেশে গিয়ে খালাফী আমলে অভ্যস্ত অথবা সালাফী হওয়া সত্ত্বেও কোন বিদআতী জামাআতের 'সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে'-এর সাহচর্য-প্রভাবে প্রভাবিত অথবা অন্য জামাআতের কোন কোন কর্ম-পদ্ধতিতে মুগ্ধ হয়ে তাদের সমর্থকে পরিণত, তাদের উদ্দেশ্যে বলা ও লেখা যে, 'তোমরা সালাফী হও সত্যিকারের।'

কারণ সত্যিকারের সালাফী অন্যায়ের সাথে আপোস করতে পারে না। কোন খালাফীর বিদআতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। 'গোদা বাড়ি ছাঁদন দড়ি এখন তুমি কার? যখন যার কাছে থাকি তখন আমি তার'---এই হিকমত অবলম্বন ক'রে আকীদা ও আমলে ত্যাগ স্বীকার করতে পারে না।

সুতরাং যখন তোমরা জানতে পারছ যে, তোমাদের সঠিক আকীদা ও মানহাজ আছে, তখন কেন অন্যের মানহাজে অভিভূত? কেন অন্যের কর্ম-পদ্ধতিতে মোহগ্রস্ত? কেন অন্যের দাওয়াত-পদ্ধতিতে মূঢ়-বশীভূত? কেন অন্যের সুশোভিত সংলাপে সম্মোহিত?

যে পরিবেশ দেখে এ পুস্তিকা রচিত, তখনকার সে পরিবেশ বর্তমান পরিবেশ থেকে পৃথক নয়। সম্মানিত লেখক সহ আরো অনেক উলামা সালাফীদেরকে ইখওয়ানী, তবলীগী, খারেজী, জিহাদী ইত্যাদি দলে শামিল হতে দেখে এ মর্মে মানুষকে সতর্ক ক'রে নানা বক্তৃতা দিয়েছেন, নানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। ফলে তাঁরা 'জামীঈন, মাদখালী' ইত্যাদি নামে কটাক্ষের শিকার হয়েছেন।

আমাকেও হয়তো সেই শিকারে পরিণত হতে হবে। তবুও হক প্রকাশে বলতে হবে, 'মনেরে আজি কহ যে,----সত্যরে লহ সহজে।'

মহান আল্লাহ সকলকে তওফীক দিন, যেন হককে হকরূপে বরণ ক'রে তার অনুসরণ করতে পারি। আর এ পুস্তিকার লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠক সকলেই তাঁর ক্ষমার শামিল হতে পারি। আমীন।

বিনীত----

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব

১৫/ ১/ ১৪৪৩হিঃ, ২৩/৮/২০২১খ্রিঃ

সূচিপত্র

শুরুর কথা ১
সুন্নাহ শব্দের উদ্দেশ্য ১৫
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের সমার্থক নামাবলী ১৮
১। সলফ শব্দের উদ্দেশ্য ২৭
২। সলফের মযহাব প্রকাশ করা ওয়াজেব ৩০
৩। সলফদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং
'সালাফী' উপাধি লাগানোর বৈধতা ৩৩
৪। সলফে সালেহীনের অনুসরণ ও তাঁদের মতাদর্শ অবলম্বন করা অপরিহার্য হওয়ার কিছু দলীল ৩৭
৫। আকীদাতে সলফের মানহাজ ৪০
সালাফী মানহাজের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলী ৪২
৬। বিদআতী ও প্রবৃত্তিপূজারীদের মানহাজ ৪৪
৭। মুক্তি ও পরিত্রাণের উপায়ঃ অনুসরণ করা এবং বিদআত বর্জন করা ৪৫
বক্র পথাবলম্বীদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ ৫৭
৮। সালাফী মানহাজের কতিপয় নীতি ৫৯
(ক) সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার ক্ষেত্রে নীতি ৫৯
(খ) ইবাদতের ক্ষেত্রে নীতি ৬১
(গ) দ্বীনের কেন্দ্রবিন্দু হল উপকারী ইল্‌ম ও নেক আমল---এর নীতি ৬২
(ঘ) অকল্যাণ দূরীভূত করা কল্যাণ আনয়নের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত---এর নীতি ৬৩
(ঙ) সকল উসূলী ও ফুরূয়ী (মুখ্য ও গৌণ) হুকুম-আহকাম দুটি বিষয় ছাড়া সম্পাদিত হয় নাঃ শর্ত পূরণ এবং বাধা অপসরণ---এর নীতি ৬৬
৯। বিদআতীদের ব্যাপারে সলফের ভূমিকা ৬৯
১০। বিরোধীর খন্ডন
১১। ব্যক্তি ও জামাআতের জন্য পালনীয় কতিপয় নিয়ম-নীতি ৮০
১২। ইসলামের উলামার নিকট যে সকল ক্ষেত্রে গীবত ও দোষবর্ণন বৈধ ৮৯
বিদআতীর গীবত বৈধ হওয়ার শর্তাবলী ৯০
বিদআতীর সমর্থকের শাস্তি ৯১

শুরুর কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ] {آل عمران:١٠٢}

[يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا] {النساء:١}

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا] {الأحزاب:٧٠-٧١}

أما بعد :

আল্লাহ নিজ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন,

[وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ] {الأنبياء:١٠٧}

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি।" (আম্বিয়া ঃ ১০৭)

তিনি তাঁর উম্মতকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً} (البقرة : ١٤٣)

"এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।" (বাক্বারাহ ঃ ১৪৩)

অর্থাৎ, ন্যায়পন্থী উম্মতরূপে, যারা হক থেকে না (চরমপন্থার) অতিরঞ্জনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, আর না (নরমপন্থার) অবজ্ঞার দিকে ঢলে পড়ে। বরং তারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে এবং মাঝামাঝি আচরণ করে। যেহেতু দ্বীনে ইসলাম অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা (চরমপন্থা ও নরমপন্থা অবলম্বন) করা থেকে নিষেধ করেছে এবং সকল কর্মে মধ্যপন্থা ও মধ্যবর্তী আচরণ গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছে। আর এই দ্বীনের অন্যতম স্পষ্টতর বৈশিষ্ট্য হল ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফ করা এবং অন্যায়াচরণ না করা ও সঠিক নিক্তি দ্বারা বিচার করা।

ইসলাম যে মধ্যপন্থা আনয়ন করেছে, কথায়, কাজে ও বিশ্বাসে, সেই মধ্যপন্থার যারা প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ। যারা নবী ﷺ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুগমন ক'রে এবং উম্মাহর সলফদের বুঝ মতে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ ক'রে ইসলামের সকল বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে। সুতরাং তারা এই মধ্যপন্থায় শামিল হওয়ায় সবার চাইতে বেশি হকদার এবং এই উম্মতের জন্য মধ্যপন্থার যে সকল অর্থ সাব্যস্ত হয়েছে, তার সবটার মধ্য হতে সর্বাধিক ও সর্বোচ্চ বেশি অংশ প্রাপ্য হল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের। তার একমাত্র কারণ, যেহেতু তারাই হল সেই উম্মতের প্রকৃষ্টতর নমুনা, যাকে আল্লাহ মধ্যপন্থী বানিয়েছেন এবং বলেছেন, তারাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমন্ডলীর জন্য তাদের অভ্যুত্থান হয়েছে। (আলে ইমরান ঃ ১১০)

বলা বাহুল্য, তারাই হল একমাত্র সম্প্রদায়, যারা যথার্থরূপে মহান আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল ﷺ-এর সুন্নতকে অনুসরণ করেছে। পক্ষান্তরে তারা ছাড়া

উম্মতের অন্য কোন ফির্কা বা দল তা করেনি। যেহেতু এমন কোন ফির্কা বা দল নেই, যার কিতাব-সুন্নাহ বিরোধী কথা ও বিশ্বাস নেই।[১]

এই জন্যই আহলে সুন্নাহ হল এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফির্কা এবং সবার মধ্যে মধ্যপন্থী দল। আর তারাই হল 'ফির্কাহ নাজিয়াহ'[২] এবং তারাই হল 'সমস্ত ফির্কার মধ্যে মধ্যপন্থী, যেমন ইসলাম হল সমস্ত ধর্মের মধ্যে মধ্যপন্থী।' এ কথা বলেছেন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ)।[৩]

আর এ কথা বিদিত যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতই হল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবা, একনিষ্ঠতার সাথে তাঁদের অনুসারিগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যে তাঁদের মানহাজে চলমান থাকবে ও তাঁদের পথের পথিক হবে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ এই 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ' নাম তখনই গ্রহণ করেছে, যখন বহু বিদআত প্রকাশ পেয়েছে, বহু সংখ্যক ভ্রষ্ট ফির্কাহর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং প্রত্যেকেই বাহ্যতঃ ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিজ নিজ বিদআত ও খেয়ালখুশির দিকে আহবান করেছে।

এখান থেকেই হকপন্থীদের জন্য জরুরী ছিল যে, তারাও এমন নামে পরিচিত হবে, যে নাম তাদেরকে অন্যান্য বিদআতী ও পথচ্যুত লোকেদের থেকে পার্থক্য সূচিত করবে। সুতরাং তখন তাদের সেই সকল শরয়ী নাম প্রকাশ পেল, যা শরীয়তের স্পষ্ট উক্তি থেকে আহরিত। তাদের নামসমূহের কতিপয় নাম হল, আহলুস সুন্নাহ, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ, ফির্কাহ নাজিয়াহ, ত্বায়েফাহ মানসূরাহ ও আহলুল হাদীস ওয়াল-আষার।

কিন্তু যখন কিছু বিদআতী ফির্কাহ 'আহলুস সুন্নাহ' নাম গ্রহণ করল, অথচ তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তখন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ 'সালাফী' নাম গ্রহণ করল এবং তাদের দাওয়াতকে 'সালাফী দাওয়াত' বলে অভিহিত করল। আর কিতাব-সুন্নাহর অনুসরণকে সলফে সালেহীনদের বুঝ অনুযায়ী হতে হবে, সেই শর্তারোপ করল। যাঁরা

---

(১) *শায়খুল ইসলাম বিন তাইমিয়্যাহ বলেছেন, 'বিশুদ্ধ হক, যাতে কোন বাতিল নেই, তা আছে আহলে সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের সাথে। আর এ কথা বহু আকীদা ও উসূল নিয়ে অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিদিত। (দ্রঃ ত্বারীকুল উসূল ইলাল ইলমিল মা'মূল ২২পৃঃ)*

(২) *দ্রঃ ওয়াসাত্বিয়াতু আহলিস সুন্নাতি বাইনাল ফিরাক্ব ২৮৭পৃঃ*

(৩) *আল-ফাতাওয়া ৪/১৪০*

হলেন সাহাবা, তাবেঈন এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁদের সেই অনুগামিগণ, যাঁরা সুন্নাহর ধারকরূপে ও তার ইমামরূপে এবং বিদআত থেকে দূরে অবস্থানকারীরূপে এবং তার ব্যাপারে সতর্ককারীরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সাহাবাদের পথ অনুসরণ করতে, তাঁদের আষার অনুগমন করতে এবং তাঁদের মানহাজ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

((وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ)) (لقمان : ١٥)

"যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর।" *(লুক্বমানঃ ১৫)*

ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'প্রত্যেক সাহাবীই আল্লাহর অভিমুখী ছিলেন। সুতরাং তাঁর পথ অবলম্বন করা ওয়াজেব। আর তাঁর কথা ও আকীদা গ্রহণ করা তাঁর সবচেয়ে বড় পথসমূহের অন্যতম। সাহাবীগণ যে মহান আল্লাহর অভিমুখী ছিলেন, তার দলীল হল, আল্লাহ তাঁদেরকে হিদায়াত করেছেন। আর তিনি বলেছেন,

((وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ)) (الشورى : ١٣)

"(আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন) এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাঁর দিকে পরিচালিত করেন। (শূরা ঃ ১৩)[৪]

সাহাবাগণ ও নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসারিগণের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট। তিনি বলেছেন,

((وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)) (التوبة : ١٠٠)

"আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন, যার তলদেশে নদীমালা প্রবাহিত; যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, এ হল বিরাট সফলতা।" (তাওবাহ ঃ ১০০)

---

(৪) *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ৪/১২০*

অতএব আহলে সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর 'সালাফী' নাম নেওয়া বিদআতের কিছু নয়। যেহেতু 'সলফ'-এর পরিভাষা 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ'র পরিভাষার পূর্ণরূপে সমান-সমান। আর সাহাবাগণের ক্ষেত্রে উভয় পরিভাষা একত্রিত হওয়া নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে এ কথা উপলব্ধ হয়। সুতরাং তাঁরাই হলেন সলফে সালেহীন এবং তাঁরাই হলেন আহলুস সুন্নাহ।

বলা বাহুল্য, যেমন আমাদের জন্য আহলুস সুন্নাহর দিকে সম্পর্ক জুড়ে 'সুন্নী' বলা সঠিক, তেমনি সালাফের প্রতি সম্পর্ক জুড়ে 'সালাফী' বলাও সঠিক; কোনও পার্থক্য নেই।[৫]

যখন বহু ফির্কা অস্তিত্বে এল এবং ফির্কাবন্দি সংঘটিত হল, তখন সলফ শব্দের মর্মার্থ সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যে ব্যক্তি সাহাবা ও শ্রেষ্ঠ যুগের বুঝ অনুসারে আকীদা ও মানহাজকে সহীহ-শুদ্ধ রাখতে যত্নবান হবে। আর এই 'সলফ' পরিভাষাটি 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ'র অন্যান্য শরয়ী নামের সমার্থক হবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে সলফের অনুসরণের প্রতি দাওয়াত অথবা সালাফী দাওয়াত হল সঠিক ইসলাম ও নিছক সুন্নাহর প্রতি দাওয়াত এবং হুবহু সেই ইসলামের প্রতি প্রত্যাবর্তনের দাওয়াত, যে ইসলাম নবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরাম তা গ্রহণ করেছেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ দাওয়াত হল হক দাওয়াত এবং এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়াও হক। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সলফের মযহাব প্রকাশ করে, তাঁদের সাথে সম্পর্ক জোড়ে এবং তাঁদের প্রতি সম্পৃক্ত হয়, সে ব্যক্তির তাতে কোন দোষ হয় না। বরং তার নিকট থেকে সেটা গ্রহণ করা ওয়াজেব। যেহেতু সলফের মযহাব হক বৈ নয়।'[৬]

সুন্নাহর প্রতি দাওয়াত দেওয়া, সলফের পথ ও মানহাজের দিকে ফিরে আসা এবং তাঁদের অনুগমন করার ব্যাপারে ইসলামের আহলুস সুন্নাহর ইমামগণের বিশাল প্রভাব ছিল। তাঁদের মধ্যে মালেক, শাফেয়ী, আহমাদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে আবী আস্বেম, আসবাহানী, আ-জুর্রী প্রমুখ। অতঃপর শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ এবং তাঁর ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িম, ইবনে আব্দিল হাদী, ইবনে

---

(৫) *দ্রঃ মাওক্বিফু আহলিস সুন্নাতি মিন আহলিল বিদা' ১/৬৩পৃঃ*

(৬) *মাজমূউ ফাতাওয়া ৪/ ১৪৯*

কাষীর, যাহাবী। অতঃপর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ও তাঁর পরবর্তী দাওয়াতের ইমামগণ। তাঁদের প্রভাবের ফলে ঐতিহাসিক কালক্রমে সালাফী গতিধারা প্রকাশ পায়। যার দ্বীন ও আকীদার মৌলিক বিষয় আহরণ করা হয় আল্লাহর কিতাব, তাঁর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ এবং সলফে সালেহীনের জীবনী থেকে এবং মোকাবেলা করা হয় প্রত্যেক সেই বিদআতী স্রোতধারাকে, যা এই মৌলিক বুনিয়াদ থেকে বের হয়ে যায়।

আমি এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য আলোচনা দীর্ঘ করলাম, কারণ আমরা শুনে ও পড়ে থাকি যে, কেউ কেউ সালাফিয়াতের ব্যাপারে এবং 'সালাফী' নাম নেওয়ার ব্যাপারে নিন্দা করছে অথবা তাকে দলবাজি (বা দলাদলি) বলে দাবি করছে অথবা বলতে চাচ্ছে যে, সালাফিয়াত ও সমসাময়িক অন্যান্য দলবাজ জামাআতগুলির মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

কেউ কেউ বলতে পারে যে, সালাফিয়াতের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব। অথচ বাস্তব এই যে, ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ) আসলে সালাফী দাঈগণের মধ্যে অন্যতম দাঈ এবং তার মুজাদ্দিদ্দগণের মধ্যে একজন মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) ছিলেন। তিনি সালাফিয়াতের নিদর্শনসমূহ মিটে যাওয়ার পর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনিই তা মলিন হওয়ার পর এবং তার উপর বিদআত ও কুসংস্কার ছেয়ে যাওয়ার পর এই (আরব) উপদ্বীপে নির্মল ও অনাবিল রূপে ফিরিয়ে দিয়েছেন। বরং এই বর্কতময় দেশ---সঊদী আরব (হারাসাহাল্লাহ) সালাফী দেশ এবং তার দাওয়াত হল সালাফী দাওয়াত। যেমন তার প্রতিষ্ঠাতা কিং আব্দুল আযীয বিন আব্দুর রহমান আ-লে সঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) এ কথা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। ১৩৬৫ হিজরীর হজ্জে তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন, 'আমি একজন সালাফী ব্যক্তি। আমার আকীদা হল সালাফিয়্যাহ, কিতাব ও সুন্নাহর ভিত্তিতে যার দাবী অনুসারে আমি চলমান।'

সেই বক্তব্যেই তিনি আরো বলেছিলেন, 'ওরা বলে, আমরা নাকি ওয়াহহাবী। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হল, আমরা সালাফী। আমরা আমাদের দ্বীন পালনে যত্নবান থাকি, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহর অনুসরণ করি এবং

আমাদের মাঝে ও মুসলিমদের মাঝে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহ ব্যতিত অন্য কিছু নেই।[৭]

বলাই বাহুল্য যে, (সঊদী) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সঠিক ইসলামের উপরে, যার ভিত্তি সলফে সালেহীনের বুঝ অনুসারে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহর উপর স্থাপিত।[৮]

এই জন্য তার রাজনীতি হিকমত ও ইনসাফের এবং গণ্য ফিকহী মযহাবগুলির সাথে উদারতার আচরণে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এরই ভিত্তিতে সঊদীয়ার শরীয়াহ কলেজসমূহের ছাত্ররা চার মযহাবের ইমামগণের---আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদের ফিক্হ অধ্যয়ন ক'রে থাকে; বিশেষ ক'রে মদীনার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। যেহেতু এই মযহাবগুলির মাঝে যে মতভেদ আছে, তা আকীদায় নয়; বরং ফিকহী গৌণ বিষয়সমূহে।

কিং আব্দুল আযীয (য়্যারহামুহুল্লাহ) বলেন, 'আমাদের চলার পথ হল সলফে সালেহীনের পথ। যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল 'কাফের' বলেছেন, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে 'কাফের' বলব না। সলফে সালেহীনের মযহাব ছাড়া কোন মযহাব নেই। আমরা কোন মযহাবকে অন্য মযহাবের উপর প্রাধান্য দেব না। সুতরাং আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও ইবনে হাম্বল আমাদের ইমাম।'

এই ইমামের উক্তি বড়ই মূল্যবান। যা সালাফিয়্যাহর সঠিক অর্থকে বিবৃত করে, যে অর্থই হল ইসলামের সঠিক অর্থ।

অধুনাকালে আমভাবে ইসলাম[৯] এবং খাসভাবে সঊদী আরব[১০] ও সালাফী দাওয়াত[১১] ইসলাম-বিদ্বেষী কিছু রাজনীতিমনস্ক ব্যক্তিত্ব ও

---

(৭) *আল-মুসহাফ ওয়াস-সাইফ ১৩৫-১৩৬পৃঃ*

(৮) *সত্যিপক্ষে এ দেশ সঠিক ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে, যা চরমপন্থা ও নরমপন্থা থেকে দূরে।*

(৯) *আর ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি ইয়াদী-খ্রিস্টান ও কাফেরদের শত্রুতা কোন আশ্চর্যের নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,*

((وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ)) (البقرة : ١٢٠)

"ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না; যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর।" (বাক্বারাহ ঃ ১২০)

(১০) *যেহেতু সে দেশ শরীয়ত বাস্তবায়ন করেছে।*

(১১) *যেহেতু তা হল সঠিক ইসলামের বাস্তব অর্থ।*

পাশ্চাত্যের লেখক কর্তৃক নানা অপবাদ, যুলম, ভাবমূর্তির বিকৃতি ও বাস্তব উল্টে দেওয়ার মতো অপরাধ আরোপের সম্মুখীন হচ্ছে। যাদের পশ্চাতে রয়েছে ইয়াহুদীবাদী মিশন। আর তাদের সাথে তাদের যুলম ও অপবাদ রটনায় রয়েছে কতিপয় দেশের সেই ব্যক্তিরা, যারা তাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে।

অথচ বাস্তব এই যে, সালাফী দাওয়াত বিনা দলীলে কাউকে 'কাফের', 'বিদআতী' বা 'ফাসেক' বলা থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করে। এই দাওয়াতই কট্টর ও চরমপন্থা হতে সবার চাইতে দূরে। কিন্তু (দুঃখের বিষয় যে,) এই বর্কতময় দাওয়াতের উপর তাই আরোপ করা হয়েছে, যা তার মধ্যে নেই এবং সেই ব্যক্তিকে তার প্রতি সম্বদ্ধ করা হয়েছে, যে তার মানহাজের সাথে যুক্ত নয়। আর এই জিনিসই উক্ত দাওয়াতের সৌন্দর্য বিকৃত করেছে, তার প্রকৃতত্ব বদলে ফেলেছে এবং তার প্রতি মানুষকে বৈমুখ ক'রে তুলেছে। এর পশ্চাতে সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট কারণ হল, সম্প্রতিকালের রাজনৈতিক ইসলামী জামাআত সমূহের বিদ্যমানতা, যা খাওয়ারিজ ফির্কার চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত। যেহেতু এই জামাআতের কিছু প্রতীকী ব্যক্তিত্ব, নেতা-সর্দার ও চিন্তাবিদ কিছু কিছু জ্ঞান-গবেষণা ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সালাফী মানহাজের অনুসারী।[১২]

বরং তাদের কেউ কেউ 'সালাফী' পরিচয়ে কথা বলে, অথচ তারা তা নয়। যার ফলে অনেক এমন মানুষের কাছেই বিষয়টি তালগোল খেয়ে যায়, যাদের নিকট প্রকৃতত্ব অস্পষ্ট, পরিণামে তারা ধারণা করে যে, এই জামাআত হল সালাফী অথবা তারা 'ওয়াহহাবী' মতবাদী; যেমন অনেকে মজার ছলে এই নামকরণ ক'রে থাকে। আর আপনি আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, অনেকে আবার এমন রাজনৈতিক জামাআতের নাম দিয়েছে 'জিহাদী সালাফী জামাআত'!

কিন্তু সে জামাআত কীভাবে 'সালাফী' হতে পারে, যে আকীদা ও মানহাজে তার বিরোধী। কীভাবে 'জিহাদী' হতে পারে, যে জামাআতে জিহাদের শরয়ী সঠিক অর্থই অবর্তমান। যেহেতু এই শ্রেণীর জামাআতগুলিতে জিহাদের শর্তাবলী বিদ্যমান নেই। আর দেখার বিষয় হল বাস্তবতা ও অর্থ, শব্দ ও অভিহিত নাম নয়। সুতরাং ইসলামী ময়দানে বর্তমানে যে তালগোল পাকানো ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার ব্যাপার রয়েছে, তার সম্বন্ধে সতর্ক থাকা এবং যে জিনিস ইসলামের অন্তর্ভুক্ত, সে জিনিস থেকে যে জিনিস তার অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তাতে

---

(১২) *যদিও তারা আকীদা ও মানহাজের অনেক বিষয়ে বিরোধী মতাবলম্বী।*

সংযুক্ত (সংযোজিত) করা হয়েছে, তা থেকে ইসলামকে নির্মল করা ওয়াজেব। যেমন ওয়াজেব হল, মুসলিম যুব-সমাজকে সেই সঠিক ইসলামের তরবিয়ত দেওয়া, যা স্বচ্ছ নির্ঝর---আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে উম্মতের সলফের বুঝ অনুযায়ী আহরিত, দ্বীনের প্রতিরক্ষা করা এবং ইসলামকে সেই রূপে প্রকাশ করা, যে রূপ তার জন্য উপযুক্ত।

আল্লাহ অনুগ্রহপূর্বক তাঁর নবী ﷺ-এর উম্মতের জন্য দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ ও নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং ইসলামকে দ্বীনরূপে মনোনীত করেছেন, যে ইসলাম ছাড়া তাঁর নিকট অন্য কোন দ্বীন গ্রহণযোগ্য নয়।

সুতরাং তিনি বলেছেন,

((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً))

(المائدة : ٣)

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।" (মায়িদাহ ঃ ৩)

তিনি আরো বলেছেন,

((وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَـاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ))

(الأنعام : ١٥٣)

"নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে।" (আন্আম ঃ ১৫৩)

ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এটা এই জন্য যে, আল্লাহর প্রতি পৌঁছনোর পথ একটাই। আর তা হল সেই পথ, যা দিয়ে তিনি তাঁর রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। এই পথ ছাড়া অন্য পথ দিয়ে কেউ তাঁর নিকট পৌঁছতে পারবে না। লোকেরা যদি সকল পথ অবলম্বন করে এবং সকল দরজা উন্মুক্ত করে, তবুও সে পথসমূহ তাদের জন্য

রুদ্ধ এবং দরজাসমূহ বন্ধ। কেবল এই একটাই পথ উন্মুক্ত, যে পথ আল্লাহর সাথে যুক্ত আছে এবং তাঁর প্রতি পৌঁছে দেয়।'[১৩]

মতবিরোধের সময় আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রতি ও তাঁর রসূল ﷺ-এর প্রতি রুজু করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আল্লাহর প্রতি রুজুর মানে তাঁর কিতাবের প্রতি রুজু এবং তাঁর রসূলের প্রতি রুজু মানে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি এবং তাঁর তিরোধানের পর তাঁর সুন্নাহর প্রতি রুজু করা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)) (النساء : ٥٩)

"অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" (নিসা ঃ ৫৯)

উক্ত আয়াতে شيء (জিনিস বা বিষয়) شرط এর বাগ্‌ধারায় نكرة (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য) রূপে এসেছে। যার অর্থ হবে ব্যাপক। অর্থাৎ, মুখ্য ও গৌণ ব্যাপকভাবে সকল ধরনের বিপরীতধর্মী মতভেদের ক্ষেত্রে (কিতাব ও সুন্নাহর প্রতি রুজু করো)।[১৪]

ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যে বিষয়ে লোকেরা মতভেদ করে, সে বিষয়ে যদি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহতে ফায়সালার বিবরণ না থাকত এবং তা যথেষ্ট না হতো, তা হলে তার প্রতি রুজু করতে বলা হতো না। কারণ এটা অসম্ভব যে, মহান আল্লাহ মতবিরোধের সময় এমন কারো প্রতি রুজু করতে নির্দেশ দেবেন, যার কাছে মতবিরোধের ফায়সালাই বর্তমান নেই।'[১৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

((إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ)) (الأنعام : ١٥٩)

---

(১৩) *তাফসীর ইবনুল কাইয়্যিম ১৪-১৫পৃঃ*

(১৪) *এ কথা বলেছেন, শায়খ শানক্বীত্বী (রাহিমাহুল্লাহ), তফসীর আয়ওয়াউল বায়ান ১/৩২৩*

(১৫) *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৪৯*

"অবশ্যই যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নেই।" (আন্‌আম ঃ ১৫৯)

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

((وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً)) (النساء : ١١٥)

"আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মু'মিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস!" (নিসা ঃ ১১৫)

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি মু'মিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাকে ধমকি দিয়েছেন। সুতরাং প্রমাণ হয় যে, আল্লাহর শরীয়ত বোঝার ব্যাপারে তাঁদের পথ অনুসরণ করা ওয়াজেব এবং তার বিপরীত করা ভ্রষ্টতা।

আল্লাহ মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, তাঁদের প্রশংসা করেছেন।

তিনি বলেছেন,

((وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)) (التوبة : ١٠٠)

"আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন, যার তলদেশে নদীমালা প্রবাহিত; যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, এ হল বিরাট সফলতা।" (তাওবাহ ঃ ১০০)

রসূল ﷺ বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দী তাঁর শতাব্দী, অতঃপর তার পরবর্তী শতাব্দী।

(خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ লোক আমার শতাব্দীর লোক। অতঃপর তাদের পরবর্তীরা। অতঃপর তাদের পরবর্তীরা। *(বুখারী ২৬৫২, মুসলিম ৬৬৩৫নং)*

নবী ﷺ তাঁর ও তাঁর সুপথপ্রাপ্ত খলীফগণের অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁদের বিরোধিতা করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন,

((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّيْنَ عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة)).

"তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত ক'রে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" *(আবু দাউদ ৪৬০৯, তিরমিযী ২৬৭৬, ইবনে মাজাহ ৪২নং)*

ফির্কাহ নাজিয়াহর গুণ বর্ণনায় তিনি বলেছেন,

((مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي)).

"আমি ও আমার সাহাবা আজ যে মতাদর্শের উপর আছি, তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" *(তিরমিযী ২৬৪১, হাকেম ৪৪৪, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৪৮৮৬, স্বাগীর ৭২৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

বলা বাহুল্য, উক্ত কিতাব ও সুন্নাহর স্পষ্ট উক্তিসমূহ এ কথাই প্রমাণ করে যে, কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ করা ওয়াজেব, যেমন মু'মিনদের পথ অনুসরণ করাও ওয়াজেব। আর যে মু'মিনদের পথ অনুসরণ করা ওয়াজেব তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাগণ। যেমন ইবনুল ক্বাইয়্যিমের উক্তি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, 'প্রত্যেক সাহাবীই আল্লাহর অভিমুখী ছিলেন। সুতরাং তাঁর পথ অবলম্বন করা ওয়াজেব। আর তাঁর কথা ও আকীদা গ্রহণ করা তাঁর সবচেয়ে বড় পথসমূহের অন্যতম।'[১৬]

ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, তোমরা (রসূল ﷺ ও সাহাবাগণের) অনুসরণ কর এবং বিদআত করো না। দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য তাঁরাই যথেষ্ট। আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।' *(ইবনে অযযাহ ১৭পৃঃ, আস-সুন্নাহ ২৮পৃঃ)*

---

(১৬) *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ৪/১২০*

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমাদের নিকট সুন্নাহর মৌলনীতি হল, যে বিষয়ের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সে বিষয়কে ধারণ করা, তাঁদের অনুগমন করা এবং বিদআত বর্জন করা।'[১৭]

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজেব হল, সলফে সালেহীনের বুঝ অনুসারে কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ করা।

মদীনা নববিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া কলেজের 'নিশাত্ব' (উদ্যম) বিভাগে যে সকল দর্স পরিবেশিত হয়, তাতে আমাকে অংশগ্রহণ করতে বলা হয়েছিল। তাতে আমি 'সহীহ মানহাজ সলফে সালেহীনের মানহাজ'[১৮] সম্পর্কিত একাধিক দর্স পরিবেশন করেছিলাম আল-হামদু লিল্লাহ। যেহেতু সালাফিয়াহর অর্থ হল, দ্বীনে ইসলামের অনুসরণ করা সেই জিনিস ও মানহাজের ভিত্তিতে, যার উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবা ও তাঁদের অনুসারিগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

কতিপয় ভাই আমার নিকট আগ্রহ প্রকাশ করেন, যাতে আমি উক্ত দর্সগুলি ছেপে প্রকাশ করি। সুতরাং আমি সেসব পুনঃনিরীক্ষণ করলাম এবং তাতে কিছু কথা সংযোজন করলাম, যা উক্ত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আর আমি তার এই নামকরণ উপযুক্ত মনে করলাম,

'কুন সালাফিয়্যান আলাল জা-দ্দাহ'।[১৯]

---

(১৭) *শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ ১/ ১৫৬*

(১৮) *শায়খ আল্লামাহ ডঃ স্বালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন, 'মানহাজ কথাটি আকীদা থেকে ব্যাপক। মানহাজ হয় আকীদা, আচরণ, চরিত্র, লেনদেন এবং মুসলিমের জীবনের সকল ক্ষেত্রে। প্রত্যেক সেই পরিকল্পনা (কর্মপদ্ধতি), যে অনুযায়ী মুসলিম চলমান থাকে, তাকে মানহাজ বলা হয়। পক্ষান্তরে আকীদার উদ্দেশ্য হল মূল ঈমান এবং দুই সাক্ষির অর্থ ও তার দাবী। এ হল আকীদা।' (আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ ৭৫পৃঃ)*

(১৯) *এই নামটি গৃহীত হয়েছে সম্মানিত শায়খ ডঃ বাক্র আবূ যায়দের লিখিত উক্তি থেকে। তিনি তাঁর মূল্যবান পুস্তিকা 'হিলয়্যাতু ত্বালিবিল ইল্‌ম' (৮পৃঃ)তে তালেবে ইল্‌মের নিজের মধ্যকার আদব সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, 'তুমি রাজপথের সালাফী হও; সলফে সালেহীন তথা সাহাবা ﷺ ও তাঁদের পরবর্তীগণের পথ, যাঁরা তাওহীদ, ইবাদত এবং অনুরূপ দ্বীনের সকল বিষয়ে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। যার বৈশিষ্ট্য হল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আষারকে মজবুতির সাথে ধারণ করা, তোমার নিজের মধ্যে সুন্নাহকে প্রতিষ্ঠা করা,*

পুস্তিকাতে শামিল হয়েছে নিম্নের বিষয়াবলী ঃ-

১। সুন্নাহ শব্দের উদ্দেশ্য

২। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের সমার্থক নামাবলী

৩। সলফ শব্দের উদ্দেশ্য

৪। সলফের মযহাব প্রকাশ করা ওয়াজেব

৫। সলফদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং 'সালাফী' উপাধি লাগানোর বৈধতা

৬। আকীদাতে সলফের মানহাজ

৭। সালাফী মানহাজের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলী

৮। বিদআতী ও প্রবৃত্তিপূজারীদের মানহাজ

৯। মুক্তির উপায়, অনুসরণ করা এবং বিদআত বর্জন করা

১০। বক্র পথাবলম্বীদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ

১১। সালাফী মানহাজের কতিপয় নীতি

(ক) সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার ক্ষেত্রে নীতি

(খ) ইবাদতের ক্ষেত্রে নীতি

(গ) দ্বীনের কেন্দ্রবিন্দু হল উপকারী ইল্‌ম ও নেক আমল---এর নীতি

(ঘ) অকল্যাণ দূরীভূত করা কল্যাণ আনয়নের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত---এর নীতি

(ঙ) সকল উসূলী ও ফুরূয়ী (মুখ্য ও গৌণ) হুকুম-আহকাম দুটি বিষয় ছাড়া সম্পাদিত হয় না ঃ শর্ত পূরণ এবং বাধা অপসরণ---এর নীতি

১২। বিদআতীদের ব্যাপারে সলফের ভূমিকা ঃ সতর্কতা অবলম্বন ও সতর্কীকরণ

১৩। বিরোধীর খন্ডন

১৪। ইসলামের উলামার নিকট যে সকল ক্ষেত্রে গীবত ও দোষবর্ণন বৈধ

১৫। বিদআতীর গীবত বৈধ হওয়ার শর্তাবলী

১৬। বিদআতীর সমর্থকের শাস্তি

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা যে, তিনি যেন আমাদেরকে কথা ও কাজে ইখলাস দান করেন, আমাদেরকে ও মুসলিমদেরকে উপকারী ইল্‌ম অর্জন ও

তর্ক-বিতর্ক, ইলমুল কালাম এবং যা পাপরাজি আনীত করে ও শরীয়ত থেকে বাধাপ্রাপ্ত করে, তা বর্জন করা।

নেক আমল করার তওফীক দেন এবং যা লিখেছি তার দ্বারা (সকলের) উপকার সাধন করেন।

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

নিজ প্রতিপালকের ক্ষমার মুখাপেক্ষী

আব্দুস সালাম বিন সালেম আস্-সুহাইমী

আল-মদীনাহ আন-নাবাবিয়্যাহ

সফর ১৪২৩হিঃ

'সুন্নাহ' শব্দের উদ্দেশ্য

যখন এ কথা বিদিত হল যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামআতের একটি সমার্থক নাম হল 'সালাফী' (জামাআত), তখন উত্তম হবে 'সুন্নাহ' শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা উল্লেখ করা। অতঃপর ক্রমশঃ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সমার্থবোধক নামগুলির সংজ্ঞা ও নামকরণের কারণ উল্লেখ করব।

'সুন্নাহ'র আভিধানিক অর্থ ঃ পদ্ধতি ও চরিত (রীতি)।[২০]

অবশ্য ভাষাবিদদের এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, সুন্নাহর আভিধানিক অর্থ কি কেবল ভালো পদ্ধতির অর্থে সীমিত, নাকি ভালো ও মন্দ উভয় পদ্ধতিই শামিল?

সঠিক হল, আভিধানিক অর্থের উদ্দেশ্য হল (আমভাবে) পদ্ধতি, চাহে সে ভালো হোক অথবা মন্দ। আর এ কথার দলীল হল, নবী ﷺ-এর হাদীস,

((مَنْ سَنَّ فِي الإسلامِ سنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورهِمْ شَيءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيهِ وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيءٌ)).

"যে ব্যক্তি ইসলামে ভালো রীতি চালু করবে, সে তার নিজের এবং ঐ সমস্ত লোকের সওয়াব পাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের সওয়াবের কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করবে, তার উপর তার নিজের এবং ঐ লোকদের গোনাহ বর্তাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের গোনাহর কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।" *(মুসলিম ২৩৯৮, নাসাঈ ২৫৫৪, ত্বাবারানী ২২৬২, ইবনে মাজাহ ২০৩, তিরমিযী ২৬৭৫নং)*

বলা বাহুল্য, নবী ﷺ পদ্ধতি বা রীতিকে ভালো রীতি ও মন্দ রীতি (দুই ভাগে) ভাগ করেছেন।

---

(২০) *আন-নিহায়াহ, ইবনুল আষীর ২/৪০৯, লিসানুল আরাব ১৭/৮৯*

বাকি থাকল 'সুন্নাহ'র পারিভাষিক অর্থ; তো এ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিষীনদের পরিভাষা রয়েছে, যেমন উসূলিয়্যীনদের এবং ফুকাহাদেরও পরিভাষা রয়েছে।

সুতরাং মুহাদ্দিষীনদের পরিভাষায় (সুন্নাহ হল, হাদীসের প্রতিশব্দ। অর্থাৎ,) মহানবী ﷺ-এর প্রত্যেক কথা, কাজ, মৌনসম্মতি, চারিত্রিক অথবা দৈহিক গুণাবলী কিংবা তাঁর জীবন-চরিত; চাহে তা নবুঅতের পূর্বের হোক অথবা পরের।[২১]

উসূলীগণের নিকট 'সুন্নাহ' বলা হয়, যা নবী ﷺ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, যা কিতাবে আযীযে স্পষ্টতঃ আসেনি, বরং নবী ﷺ-এর স্পষ্ট উক্তি হিসাবে এসেছে, যা প্রথমতঃ কিতাবে যা এসেছে তার বয়ান।[২২]

ফকীহদের পরিভাষায় সুন্নাহ (সুন্নত) হল, যা ওয়াজেব নয়। বলা হয়, এটা সুন্নত। তার মানে তা ফরয বা ওয়াজেব নয়, হারাম নয়, মকরূহও নয়।[২৩]

কিন্তু অনেক সলফদের নিকট সুন্নাহ হল এর চাইতেও ব্যাপক। কারণ তাঁরা সুন্নাহর অর্থ মুহাদ্দিষীন, উসূলিয়্যীন ও ফুকাহাদের অর্থের চাইতেও ব্যাপক বলে থাকেন। তাঁরা 'সুন্নাহ' বলতে বুঝান, 'আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহর অনুযায়ী হওয়া, চাহে তা আকীদার বিষয়ে হোক, বা ইবাদতের বিষয়ে। আর তার বিপরীত হল, বিদআত।

সুতরাং বলা হয় যে, 'অমুক সুন্নাহর উপরে আছে।' যখন তার আমলসমূহ আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহর মোতাবেক হয়।

আর বলা হয়, 'অমুক বিদআতের উপর আছে।' যখন তার আমল কিতাব ও সুন্নাহর অথবা উভয়ের একটির বিরোধী হয়।

শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'সলফদের কথায় সুন্নাহ শব্দটি ইবাদত ও আকীদার সুন্নাহকে শামিল করে। যদিও সুন্নাহর উপর অনেক লেখকের উদ্দেশ্য হল আকীদার বিষয়সমূহের কথা।'[২৪]

---

(২১) *কাওয়াইদুত তাহদীষ, ক্বাসেমী ৬৪পৃঃ*
(২২) *দ্রঃ উসূলুল আহকাম, আ-মেদী ১/১৬৯*
(২৩) *শারহুল কাওকাবিল মুনীর ২/১৬০*
(২৪) *আল-আমরু বিল-মা'রূফি ওয়ান-নাহয়্যু আনিল মুনকার ৭৭পৃঃ*

তিনি 'আল-হামাবিয়্যাহ'তে বলেছেন, 'সুন্নাহ হল সেই জিনিস, যার উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (এবং তাঁর সাহাবীগণ) প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, চাহে তা আকীদা হোক বা মধ্যপন্থী স্থায়ী আচরণ, কথা হোক বা কাজ।'[২৫]

ইবনে রজব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'পরবর্তীকালের বহু উলামা 'সুন্নাহ'কে আকীদার বিষয়ে নির্দিষ্ট করেছেন। কারণ তা হল দ্বীনের মৌলিক বিষয় এবং তার বিরোধী বিশাল বিপন্ন।'[২৬]

আমি (লেখক) বলি, আকীদার ক্ষেত্রে যখন 'সুন্নাহ' শব্দ ব্যবহার করা হবে, তখন তার উদ্দেশ্য হবে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। আর তখন উলামায়ে হাদীস, উলামায়ে উসূল ও উলামায়ে ফিকহের পারিভাষিক অর্থ উদ্দিষ্ট হবে না।

ইবনে রজব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'সুন্নাহ হল চালু পথ (অনুসৃত তরীকা)। আর তা হল, নবী ﷺ ও তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীন যে আকীদা, আমল ও বক্তব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাই শক্তভাবে ধারণ করার নামান্তর। এটাই হল পরিপূর্ণ সুন্নাহ। এ জন্যই পূর্বকালে সলফগণ ঐ সকল অর্থ ছাড়া 'সুন্নাহ' শব্দ ব্যবহার করতেন না। অনুরূপ কথারই অর্থ হাসান (বাসরী) আওযাঈ ও ফুযাইল বিন ইয়ায থেকে বর্ণিত আছে।'[২৭]

(২৫) *আল-হামাবিয়্যাহ ২পৃঃ*
(২৬) *জামেউল উলূম ওয়াল-হিকাম ২৪৯পৃঃ*
(২৭) *জামেউল উলূমি ওয়াল-হিকাম ঃ হাদীস নং ২৮*

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের সমার্থক নামাবলী

(আহ্‌ল মানে ওয়ালা, অধিকারী। একবচন-বহুবচন) 'আহলুশ শাই' জিনিস-ওয়ালাই সে বিষয়ে অন্যান্য লোকের তুলনায় সবার চেয়ে বেশি বিশিষ্ট হয়। কথায় বলা হয়, أهل الرجل أخص الناس به ব্যক্তির আহল (তার পরিবার বা সঙ্গীসাথী) তার বিশেষ লোক। 'আহলুল বাইত' (ঘর-ওয়ালা) ঘরের বাসিন্দাকে বলা হয়। 'আহলুল ইসলাম' (ইসলাম-ওয়ালা) ইসলাম-অবলম্বীকে বলা হয়। 'আহলুল-মাযহাব' (মযহাব-ওয়ালা) মযহাব অবলম্বীকে বলা হয়।

বলা বাহুল্য, 'আহলুস সুন্নাহ' (সুন্নাহ-ওয়ালা) সুন্নাহর ব্যাপারে অন্যান্য লোকের মধ্যে বিশিষ্ট। (সুন্নাহর বিশেষ লোক।) তারাই সবার চাইতে বেশি তা মজবুতির সাথে ধারণকারী। তারাই কথা, কাজে ও বিশ্বাসে সবার চাইতে বেশি তার অনুসরণকারী।

'আহলুস সুন্নাহ' একটি পরিভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার উদ্দেশ্য দুটির মধ্যে একটি অর্থ ঃ

এক ঃ ব্যাপক অর্থ। আর এ ব্যাপকতায় রাফেযী ছাড়া সকল ইসলাম ধর্মাবলম্বী প্রবিষ্ট। (অর্থাৎ, সুন্নীরা।)

দুই ঃ সীমিত বা বিশেষ অর্থ, যা ব্যাপক অর্থ থেকে সংকীর্ণ। আর তার উদ্দেশ্য হল বিদআতমুক্ত খাঁটি সুন্নাহ-ওয়ালা। (অর্থাৎ, বিদআতী নয়।) আর এই অর্থে (আহলুস সুন্নাহ) থেকে সকল প্রবৃত্তিপূজারী 'আহলুল বিদআহ' (বিদআতী), যেমন খাওয়ারিজ, জাহমিয়্যাহ, মুর্জিয়াহ, শীআহ (শিয়া) প্রভৃতি বের হয়ে যায়।

শায়খুল ইসলাম বলেন, 'আহলুস সুন্নাহ শব্দ থেকে উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি (প্রথম) তিন খলীফার খিলাফতকে স্বীকার করে। সুতরাং এর অর্থে রাফেযী ছাড়া অন্য সকল ফির্কা প্রবিষ্ট হয়। কখনো এর উদ্দেশ্য হয় আহলুল হাদীস ও খাঁটি সুন্নাহ-ওয়ালা। সুতরাং এই অর্থে কেবল সেই প্রবেশ করবে, যে মহান আল্লাহর সিফাত (গুণাবলী) সাব্যস্ত করে, কুরআন সৃষ্টি নয় বলে, আখেরাতে আল্লাহকে দেখা যাবে বিশ্বাস করে, তকদীরে বিশ্বাস রাখে এবং এ ছাড়া আরো

অন্যান্য বিষয়েও বিশ্বাস রাখে, যা আহলুল হাদীস ওয়াস সুন্নাহর নিকট পরিচিত।[২৮]

সুতরাং আহলুস সুন্নাহ হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ। যেহেতু তাঁরাই সরাসরি তাঁর নিকট থেকে (সকল সুন্নাহ) আকীদার মৌলিক বিষয়সমূহ গ্রহণ করেছেন, যেমন ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়াবলীও গ্রহণ করেছেন। অতএব তাঁরাই নবী ﷺ-এর সুন্নাহকে সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবার চাইতে বেশি জানেন এবং তাঁদের পরবর্তীদের তুলনায় তাঁরাই সবচেয়ে বেশি তার অনুসরণ করেছেন।

আর আহলুস সুন্নাহ তাঁরাও, যাঁরা তাঁদের তাবেঈন, নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসারিগণ। প্রত্যেক যুগে ও স্থানে যাঁরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলেন। আর তাঁদের শীর্ষে রয়েছেন আহলুল হাদীস ওয়াল আষার।

অতঃপর যখন এই 'আহলুস সুন্নাহ'র উপাধির প্রয়োগ হল তাঁদের জন্য, যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবা এবং তাঁরা, যাঁরা সেই হিদায়াতের অনুসারী, যার উপর তাঁরা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন সকল ফির্কা সেই উপাধি কাড়াকাড়ি ক'রে ছিনিয়ে নিল। (সকল ফির্কাই দাবী করল, আমরাই আহলুস সুন্নাহ।) কিন্তু দেখার বিষয় হল বাস্তবতা। দাবীর ভিত্তিতে কিছু প্রমাণ হয় না। আসলে যখন ইসলামে বিদআত সৃষ্টি হল, পথভ্রষ্ট নানা ফির্কার প্রাদুর্ভাব ঘটল এবং বাহ্যতঃ (নামধারী) মুসলিম হয়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিদআত ও খেয়ালখুশির দিকে আহবান শুরু করল, তখন আহলুল হক (হকপন্থী)দের জন্য আবশ্যক ছিল এমন নাম দ্বারা নিজেদেরকে পরিচিত করা, যার মাধ্যমে বিদআতপন্থী ও আকীদায় বিভ্রান্ত ফির্কা থেকে পার্থক্য সূচিত করবে। সুতরাং তখনই তাঁদের শরয়ী নাম প্রকাশলাভ করল, যা ইসলাম থেকে সংগৃহীত। তাঁদের নামাবলীর কতিপয় হল, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, ফির্কাহ নাজিয়াহ, ত্বায়েফাহ মানসূরাহ, আহলুল হাদীস ওয়াল আষার, সালাফী বা সালাফিয়্যুন।

তাঁদের এই নামাবলী নিয়ে যে ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করবে, তার কাছে স্পষ্ট হবে যে, তার প্রত্যেকটিই ইসলামের প্রতি নির্দেশ করে। কিছু নাম শরীয়তের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। কিছু নাম ইসলামের সঠিক তত্ত্বানুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত। আর সে সব নাম আহলুল বিদআহ (বিদআতী)দের নাম ও উপাধিসমূহ

---

(২৮) *মিনহাজুস সুন্নাহ ২/ ১৬৩*

থেকে ভিন্ন। সুতরাং বিদআতীদের নাম বা উপাধি কোন ব্যক্তির প্রতি সম্পর্ক জুড়ে রাখা হয়ে থাকে। যেমন ঃ-

জাহমিয়্যাহ ঃ জাহ্‌ম বিন সাফওয়ান

যাইদিয়্যাহ ঃ যায়দ বিন আলী বিন হুসাইন

কুল্লাবিয়্যাহ ঃ আব্দুল্লাহ বিন কুল্লাব

কার্রামিয়্যাহ ঃ মুহাম্মাদ বিন কার্রাম

আশআরিয়্যাহ ঃ আবূল হাসান আশআরীর দিকে সম্পর্ক জুড়ে তাদের নামকরণ হয়েছে।

অথবা তাদের মূল বিদআতের উদ্ভূত শব্দ থেকে উপাধি প্রসিদ্ধ হয়েছে। যেমন ঃ-

রাফেযী, রাফেযাহ ঃ যেহেতু তারা যায়দ বিন আলীকে অথবা প্রথম দুই খলীফার খিলাফাতকে 'রফ্‌য' (প্রত্যাখ্যান) করে।

নাস্বেবী, নাওয়াস্বিব ঃ যেহেতু তারা আহলে বায়তের প্রতি শত্রুতা 'নস্বব'(স্থাপন) করে।

ক্বাদারী, ক্বাদারিয়্যাহ ঃ যেহেতু তারা 'ক্বাদার' (তকদীর)কে অস্বীকার করে।

সূফী, সূফিয়্যাহ ঃ যেহেতু তারা সূফ (পশম) পরিধান করে।

বাত্বেনী, বাত্বেনিয়্যাহ ঃ যেহেতু তারা মনে করে, শরীয়তের উক্তিতে যাহের ও বাত্বেন (প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয়) আছে।

মুরজিআহ ঃ যেহেতু তারা মূল ঈমান থেকে আমলকে 'ইরজা' (স্থগিত) করে। (তারা মনে করে, আমল ঈমানের অংশ নয়।)

অথবা সে সব উপাধি তাদের মুসলিমদের আকীদা ও জামাআত থেকে বের হওয়ার কারণ স্বরূপ হয়ে থাকে। যেমন ঃ-

খারেজী, খাওয়ারিজ ঃ যেহেতু তারা আমীরুল মু'মিনীন আলী বিন আবী তালেব ﷺ-এর বিরুদ্ধে 'খুরুজ' (বিদ্রোহ) করেছিল।

মু'তাযেলী, মু'তাযিলাহ ঃ যেহেতু তাদের সর্দার ওয়াসিল বিন আত্বা হাসান বাসরীর মজলিস থেকে 'ই'তিযাল' (পৃথক বাস) করেছিল।[২৯]

---

(২৯) *দ্রঃ মাউক্বিফু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআতি মিন আহলিল বিদা', সম্মানিত ভাই ডঃ ইব্রাহীম রুহাইলী ১/৪৫-৪৬, আর উক্ত পুস্তকটি মূল্যবান এবং স্ববিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ।*

শায়খ বাক্‌র আবূ যায়দ তাঁর পুস্তক 'হুকমুল ইনতিমাই ইলাল ফিরাক্বি ওয়াল আহযাবি ওয়াল জামাআতিল ইসলামিয়্যাহ (২১পৃঃ)তে বলেছেন, 'যখন ঐ ফির্কাহগুলি ইসলামের সাথে সম্পর্ক জুড়ে মুসলিমদের মেরুদন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, তখন (আহলুস সুন্নাহ)র মুসলিমদের জামাআতের পার্থক্য সূচিতকারী শরয়ী উপাধি প্রকাশ পেল। যাতে তাদের ভিতর থেকে ফির্কাবন্দি ও খেয়ালখুশির (সংমিশ্রণ) অপনোদন করা যায়। আর এতে কোন পার্থক্য নেই যে, মূল শরীয়ত থেকে তাদের কোন প্রমাণিত নাম ছিল; যেমন জামাআত, ফির্কাহ নাজিয়াহ, ত্বায়েফাহ মানসূরাহ অথবা বিদআতীদের সামনে তাদের সুন্নাহসমূহের পালনের মাধ্যমে সে নাম (গৃহীত) হয়েছিল। এই জন্য প্রথম জামাআতের সাথে তাদের সংযোগ ছিল, তাই তাদেরকে 'সলফ, আহলুল হাদীস, আহলুল আষার, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ' বলা হয়েছে। আর এই সকল সম্মানজনক উপাধি যে কোনও ফির্কাহর উপাধি থেকে ভিন্নতর। এর একাধিক কারণ রয়েছে ঃ-

এক ঃ সেগুলি এমন পদবী, যা নবুঅতের পন্থায় ইসলামী উম্মতের অস্তিত্ব লাভের সময় থেকে ক্ষণিকের জন্য হলেও চ্যুত হয়নি। যেহেতু তা সকল মুসলিমদেরকে শামিল করে, যাঁরা প্রথম জামাআতের তরীকায় এবং যাঁরা ইল্ম গ্রহণে, তা বোঝার পদ্ধতিতে এবং তার দিকে দাওয়াতী প্রকৃতিতে সেই জামাআতের অনুগামী, তাঁদের তরীকায় বর্তমান আছেন। সুতরাং সে পদবী কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটা বোঝা আবশ্যক যে, সেটা (মানুষের) জীবন অবশিষ্ট কাল পর্যন্ত চলমান অর্থ। আর আবশ্যিকভাবে ফির্কাহ নাজিয়াহ উলামায়ে হাদীস ও সুন্নাহর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁরাই হলেন এই মানহাজের অধিকারী। তা অবশিষ্ট থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী থেকে সে কথা বুঝা যায়। তিনি বলেছেন,

((لاَ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)).

"চিরকালের জন্য আমার উম্মতের একটি দল (হকের উপর) সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে, কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে উপেক্ষাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" *(আহমাদ ১৫৫৯৭, তিরমিযী ২১৯২, ইবনে মাজাহ ৬নং)*

দুই ঃ সেগুলি এমন পদবী, যা পুরো ইসলাম, কিতাব ও সুন্নাহকে শামিল করে। তা এমন কোন বৈশিষ্ট্যগত সংজ্ঞার সাথে বিশিষ্ট নয়, যা কিতাব ও সুন্নাহর পরিপন্থী; না সংযোজনে, না বিয়োজনে।

তিন ঃ সেগুলি এমন পদবী, যার কিছু সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। তার মধ্যে এমন কিছু পদবী আছে, যা খেয়ালখুশির পূজারী ও ভ্রষ্ট ফির্কার মোকাবেলার জন্যই প্রকাশ পেয়েছে। যাতে তাদের বিদআতের খন্ডন হয়, তাদের থেকে নিজেদেরকে পৃথক করা যায়, তাদের সাথে একাকার হওয়া থেকে দূরে থাকা যায় এবং তাদেরকে বর্জন করতে পারা যায়।

বলা বাহুল্য, যখন বিদআত প্রকাশ পেল, তখন তাঁরা 'সুন্নাহ' দ্বারা স্বতন্ত্রতা অর্জন করলেন, যখন রায়কে ফায়সালার জন্য ব্যবহার করা হল, তখন তাঁরা 'হাদীস ও আষার' দ্বারা বিশিষ্টতা অর্জন করলেন এবং যখন পশ্চাদ্‌বর্তীদের মাঝে বিদআত ও স্বেচ্ছাচারিতা ছড়িয়ে পড়ল, তখন তাঁরা 'সলফের আদর্শ' দ্বারা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করলেন। আর এইভাবে অন্য পদবীর ক্ষেত্রেও।

চার ঃ আহলুস সুন্নাহর কাছে ভালোবাসা ও সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং বন্ধুত্ব গড়া ও শত্রুতা করা হয় ইসলামের ভিত্তিতে। কোন নির্দিষ্ট নামের বৈশিষ্ট্যগত সংজ্ঞার ভিত্তিতে নয় এবং (নামহীন) নিছক বৈশিষ্ট্যগত সংজ্ঞার ভিত্তিতেও নয়। ভিত্তি হল একমাত্র কিতাব ও সুন্নাহ।[৩০]

পাঁচ ঃ সেই সকল পদবী ধারণ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতিত অন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে অন্ধ পক্ষপাতিত্বের কারণে নয়।

ছয় ঃ সেই সকল পদবী কোন বিদআত, পাপাচরণ অথবা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের পক্ষে অন্ধ পক্ষপাতিত্বের দিকে পৌঁছে দেয় না।'

এখন আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সমার্থক নামগুলির সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা ও পরিচিতি শুরু করি।

১। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ

এই নাম প্রসিদ্ধ নামাবলীর অন্যতম, যার মাধ্যমে আহলুস সুন্নাহ পরিচিতি লাভ করেছে। যে নাম 'সুন্নাহ' যুক্ত ক'রে প্রয়োগ ক'রে বলা হয়, 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ।' এককভাবে বলা হয়, 'আহলুস সুন্নাহ।' আর

(৩০) *সলফে সালেহীনের বুঝ অনুযায়ী।*

আহলুল জামাআহও বলা হয়। তবে এর ব্যবহার কম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার সাথে 'সুন্নাহ' যোগ করা হয়।

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'সুন্নাহ জামাআহ (একতা)র সাথে সংযুক্ত, যেমন বিদআহ 'ফুর্কাহ' (বিচ্ছিন্নতা)র সাথে সংযুক্ত। সুতরাং বলা হয়, 'আহলুস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ', যেমন বলা হয়, 'আহলুল বিদআতি ওয়াল ফুর্ক্বাহ।'(৩১)

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর এই নামকরণের পশ্চাতে অন্যতম কারণ হল, তাঁরা দুটি বৃহৎ বৈশিষ্ট্য দ্বারা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছেন ঃ-

এক ঃ তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেছেন, পরিশেষে তাঁরা তার আহল (ওয়ালা) হয়ে গেছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য ফির্কাগুলি তাদের নিজস্ব খেয়ালখুশি ও নেতাদের উক্তিসমূহকে আঁকড়ে ধরেছে। সুতরাং তারা সুন্নাহর প্রতি নিজেদের সম্পর্ক জোড়ে না; বরং তারা বিদআতের প্রতি অথবা তাদের ইমামগণের প্রতি অথবা তাদের কর্মকান্ডের প্রতি সম্পর্ক জোড়ে। যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

দুই ঃ তাঁরা হলেন আহলুল জামাআহ। যেহেতু তাঁরা হকের উপর জমায়েত ও ঐক্যবদ্ধ এবং তাঁরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন নন। পক্ষান্তরে অন্যান্য ফির্কাগুলি হকের উপর একতাবদ্ধ নয়। তারা তো নিজ নিজ খেয়ালখুশির অনুসরণ করে। সুতরাং তাদেরকে জমায়েতকারী কোন হক নেই।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ 'আহলুস সুন্নাহ'র সংজ্ঞায় বলেন, 'তাঁরা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহর ধারক এবং (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম মুহাজির ও আনসারগণ, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাঁদের অনুগামী, তাঁরা যার উপর একমত হয়েছেন, তার ধারক।'(৩২)

২। আহলুল হাদীস (আহলে হাদীস)

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর যে সকল নাম দেওয়া হয়, তার মধ্যে অন্যতম হল 'আহলুল হাদীস।' আর এ নাম বহু ইমামের বক্তব্যে উল্লিখিত হয়, যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ প্রমুখ তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আহলে ইল্মগণ। তাঁরা 'আহলুল হাদীস, আহলুস সুন্নাহ'র আকীদা বয়ান

(৩১) *আল-ইস্তিক্বামাহ ১/৪২*
(৩২) *মাজমূউল ফাতাওয়া ২/৩৭৫*

করতে গিয়ে এই নাম উল্লেখ ক'রে থাকেন এবং উভয় পরিভাষায় কোন পার্থক্য করেন না।

ইমাম স্বাবূনী তাঁর 'আকীদাহ' গ্রন্থে বলেন, 'কিতাব ও সুন্নাহর ধারক আসহাবুল হাদীস---আল্লাহ তাঁদের জীবিতদেরকে হিফাযত করুন এবং মৃতদেরকে রহম করুন---মহান আল্লাহর একত্ববাদের এবং রাসূল ﷺ-এর রিসালাত ও নবুঅতের সাক্ষ্য দেন।----' অতঃপর তিনি বলেন, 'আল্লাহ আহলুস সুন্নাহকে (তাঁর সিফাতে) শব্দবিকৃতি, কেমনত্ব বর্ণনা ও সদৃশ বর্ণনা করা থেকে আশ্রয়দান করেছেন এবং জানানো ও বুঝানোর (তওফীক) দ্বারা তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।[৩৩]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, 'সলফ আহলুল হাদীস ওয়াস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ----।'[৩৪]

বলা বাহুল্য, সলফদের আকীদার কিতাবসমূহে 'আহলুল হাদীস' কথার উদ্দেশ্য হল 'আহলুস সুন্নাহ।' ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, 'আমরা আহলুল হাদীস বলে এ অর্থ বুঝাতে চাচ্ছি না যে, তাঁরা হাদীস শোনা, লেখা ও বর্ণনা করার মাঝে সীমাবদ্ধ। বরং উক্ত কথায় আমাদের উদ্দেশ্য হল, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি হাদীসের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিকভাবে সংরক্ষণ করা, চেনা ও বোঝার এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিকভাবে তার অনুসরণ করার বেশি হকদার এবং অনুরূপভাবে আহলুল কুরআন।'[৩৫]

৩। আষারিয়্যাহ, আষারী বা আহলুল আষার

এই নামটি বহু উলামা ব্যবহার করেছেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্য হল, আহলুস সুন্নাতি ওয়াল হাদীস।

ইবনে আবী হাতেম রাযী বলেছেন, আমাদের মযহাব ও এখতিয়ার হল রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর সাহাবা ও তাবেঈনগণের অনুসরণ করা এবং 'আহলুল আষার' যেমন আবূ আব্দিল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বলের মযহাবকে আঁকড়ে ধরা।'[৩৬]

---

(৩৩) *আকীদাতুস সালাফ আসহাবিল হাদীস ৪২৩পৃঃ*
(৩৪) *দারউ তাআরুযিল আক্বলি ওয়ান নাক্বল ১/২০৩*
(৩৫) *মাজমূউল ফাতাওয়া ৪/৯৫*
(৩৬) *শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ ১/১৭৯*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'আহলুল বিদআহর লক্ষণ হল আহলুল আষারের কুচ্ছা গাওয়া, নাস্তিকদের লক্ষণ হল আহলুস সুন্নাহকে 'হাশাবিয়্যাহ' আখ্যায়ন করা, ক্বাদারিয়্যাহর লক্ষণ হল আহলুল আষারকে 'মুজবিরাহ' (মানুষ তার কর্মাকর্মে বাধ্য ও এখতিয়ারহীন---এই মতবাদে বিশ্বাসী) নামে উল্লেখ করা, মুর্জিয়ার লক্ষণ হল আহলুস সুন্নাহকে 'মুখালিফাহ' (বিরোধী) ও 'নুক্বস্বানিয়্যাহ' (ঈমান অসম্পূর্ণতার দাবীদার) বলে অভিহিত করা এবং রাফেযাহর লক্ষণ হল আহলুস সুন্নাহকে 'নাস্বেবাহ' (আহলে বায়তের প্রতি শত্রুতা স্থাপনকারী) নামে উল্লেখ করা।'[৩৭]

এ কথা বহু উলামার বক্তব্যে উল্লিখিত হয়েছে, যেমন আবূ নাস্র সাজাযী, ইবনে তাইমিয়্যাহ, সাফ্ফারীনী প্রমুখ আহলুল ইল্ম।[৩৮]

তাঁরা 'আষার'-এর প্রতি সম্পৃক্ত ক'রে উক্ত নাম উল্লেখ করেছেন। আর পরিভাষায় 'আষার' হল হাদীসের প্রতিশব্দ।

'আহলুল আষার'-এর অর্থ, যেমন সাফ্ফারীনী বলেছেন, 'অর্থাৎ, যাঁরা নিজেদের আকীদা মহান আল্লাহর কিতাব ও নবী ﷺ-এর সুন্নাহতে যা বর্ণিত অথবা সলফে সালেহীন সম্মানিত সাহাবা ও তাবেঈনদের নিকট থেকে যা সহীহ প্রমাণিত, তা থেকে গ্রহণ করেন।'[৩৯]

আর এ হল সলফদের ব্যবহারে 'আহলুস সুন্নাহ'র অর্থে।[৪০]

৪। ফির্কাহ নাজিয়াহ

(এ নামের অর্থ ঃ মুক্তিপ্রাপ্ত দল।) 'নাজিয়াহ' (মুক্তিপ্রাপ্ত) জাহান্নাম হতে। নবী ﷺ তাঁর বাণীতে যখন (তিয়াত্তর) ফির্কাহর কথা উল্লেখ করেছিলেন, তখন ব্যতিক্রমসূচক বাক্যে বলেছিলেন, "একটি ব্যাতিরেকে সবগুলি জাহান্নামী।" অর্থাৎ, (ঐ একটি ফির্কা) জাহান্নামী নয়।[৪১]

---

(৩৭) *ঐ*

(৩৮) *দ্রঃ আর্রাদ্দু আলা মান আনকারাল হার্ফা ওয়াস স্বাওত ১৭৫, ১৭৭, ১৭৯পৃঃ, দারউত তাআরুয ৬/২৬৬, লাওয়ামিউল আনওয়ার ১/৬৪*

(৩৯) *লাওয়ামিউল আনওয়ার ১/৬৪*

(৪০) *ওয়াসাত্বিয়্যাতু আহলিস সুন্নাতি বাইনাল ফিরাক্ব ১১৯পৃঃ*

(৪১) *((افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)). قالوا : من هي يا رسول الله ؟*

শায়খ হাফেয হাকামী 'মাআরিজুল ক্বাবূল' গ্রন্থে (১/১৯)এ বলেছেন, 'সত্যবাদী ও সত্যায়িত (নবী ﷺ) জানিয়েছেন, ফির্কাহ নাজিয়াহ হল তারা, যারা তিনি ও তাঁর সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছেন, তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।'

৫। ত্বায়েফাহ মানসূরাহ (সাহায্যপ্রাপ্ত দল)

এ নামটি মুগীরাহ বিন শু'বাহ ﷺ-এর হাদীসে বর্ণিত নবী ﷺ-এর বাণী থেকে সংগৃহীত। তিনি বলেছেন,

((لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ)).

"আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল চিরকাল (সত্যের সাথে) বিজয়ী থাকবে, আল্লাহর আদেশ (কিয়ামতের পূর্বমুহূর্ত) আসা পর্যন্ত। তারা তখনও বিজয়ী থাকবে।" *(বুখারী ৭৩১১, মুসলিম ৫০৬০নং)*[৪২]

৬। সালাফিয়্যাহ, সালাফী, সালাফিয়্যুন

'সালাফ'-এর দিকে সম্পর্ক জুড়ে এ নাম। অভিধানে 'সালাফ' সালেফ শব্দের বহুবচন। আর সালেফ মানে অগ্রিম, অগ্রণী, অগ্রবর্তী। সুতরাং 'সালাফ'

قال : ((الجماعة)). وفي رواية : ((ما أنا عليه وأصحابي)).

"ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিষ্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব ক'টি জাহান্নামে যাবে।" অতঃপর ঐ একটি দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "তারা হল জামাআত।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" (সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)

(৪২) *যাঁরা মনে করেন 'ত্বায়েফাহ মানসূরাহ ও ফির্কাহ নাজিয়াহ' দুটি পৃথক জামাআত, তাঁরা ভুল করেন। যেহেতু উভয়ই একই জিনিস।*

*****লক্ষণীয় যে, উক্ত হাদীসে 'মানসূর' শব্দ নেই। অন্য একটি হাদীসে আছে,*

((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)).

"চিরকালের জন্য আমার উম্মতের একটি দল (হকের উপর) সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে, কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে উপেক্ষাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" (আহমাদ ১৫৫৯৭, তিরমিযী ২১৯২, ইবনে মাজাহ ৬নং)---অনুবাদক

মানে অগ্রবর্তী জামাআত (যারা অতীত হয়ে গেছে)। এই অর্থ রয়েছে মহান আল্লাহর এই বাণীতে,

[فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ] {الزُّخرف:٥٦}

"পরবর্তীদের জন্য আমি ওদেরকে অতীতের মানুষ ও দৃষ্টান্ত ক'রে রাখলাম।" (যুখরুফ ঃ ৫৬)

বাগাবী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তফসীরে বলেছেন, 'সলফ, বাপ-দাদাদের মধ্যে যারা গুজরে গেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে অগ্রবর্তী করলাম, যাতে পরবর্তীরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।'

ইবনুল আষীর বলেছেন, 'মানুষে সলফ হল তারা, যে বাপ-দাদা ও আত্মীয়রা মৃত্যুর ফলে আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে। এই জন্য তাবেঈনদের প্রথম জামাআতের নাম 'সলফে স্বালেহ' দেওয়া হয়েছে।

এ হল অভিধানে। কিন্তু পরিভাষায় 'সলফে স্বালেহ' বলতে উদ্দেশ্য কী? আকীদায় তাঁদের মানহাজ কী? তাঁদের মানহাজের প্রধান প্রধান গুণাবলী কী কী?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা আগামী দর্সগুলিতে জানব---ইন শাআল্লাহ।

১। সলফ শব্দের উদ্দেশ্য

পূর্বে 'সালাফ'-এর আভিধানিক অর্থ উল্লিখিত হয়েছে। এখন দেখব, পরিভাষায় 'সালাফ' শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ কী?

এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে এবং বিভিন্ন মত রয়েছে, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মত হল নিম্নরূপ ঃ-

(ক) তাঁরা হলেন কেবল সাহাবীগণ।

(খ) তাঁরা হলেন, সাহাবী ও তাবেঈগণ।

(গ) তাঁরা হলেন, সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে'-তাবেঈগণ।

(ঘ) যাঁরা পাঁচ শত হিজরীর পূর্বে গত হয়েছেন।

শেষোক্ত মতের বক্তাগণ মনে করেন, সেটা হল একটা মযহাব, যা নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা অতিক্রম্য নয়। অতঃপর ইসলামী চিন্তাধারা তার পরবর্তীকালে তার ব্যক্তিগণ দ্বারা উন্নত হয়।

তাহলে সময়কাল নির্ধারণ করা কি 'সালাফ' শব্দের তাৎপর্য নির্ণয় করার জন্য যথেষ্ট?

যদি বলি, সময় নির্ধারণ ক'রে সলফ বলতে উদ্দেশ্য হল প্রাথমিক শ্রেষ্ঠ তিনটি শতাব্দী। যেহেতু শ্রেষ্ঠ শতাব্দী নির্ধারণের ব্যাপারে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাহলে কি যাঁরাই এই শতাব্দীগুলিতে বেঁচে ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককেই অনুসরণীয় 'সলফ' গণ্য করব?

নিঃসন্দেহে এটা সঠিক নয়। সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তর হল না-সূচক। যেহেতু উক্ত সময়কালের ভিতরে বহু (ভ্রষ্ট) ফির্কাহ ও জামাআতের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।

বলা বাহুল্য, সলফ নির্ধারণে কালের অগ্রবর্তিতাই যথেষ্ট নয়। বরং এই কাল-অগ্রবর্তিতার সাথে তার মতের কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারী হওয়ার কথা যুক্ত করতে হবে। সুতরাং যার মত কিতাব ও সুন্নাহর বিরোধী হবে, সে সালাফী নয়; যদিও সে সাহাবা ও তাবেঈনদের মাঝে জীবনধারণ করেছে।[৪৩]

বুঝা গেল, উক্ত সময়কালে কোন ব্যক্তির বিদ্যমানতা এই ফায়সালা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় যে, সে সলফের মযহাবে ছিল। যতক্ষণ না সে তার কথা ও কাজে কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারী ছিল এবং বিদআতী ছিল না বলে জানা গেছে। এই জন্য বহু উলামা এই পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষণ যুক্ত বা শর্তারোপ ক'রে বলেন, 'সলফে স্বালেহ।'

ইমাম সাফ্ফারীনী বলেছেন, 'সালাফের মযহাব বলতে উদ্দেশ্য হল, সেই মতাদর্শ, যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম ﷺ এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসারী (তাবেঈন)গণ এবং তাঁদের অনুসারী (তাবে-তাবেঈন)গণ এবং দ্বীনের সেই ইমামগণ, যাঁদের ইমামতের প্রত্যয়ন আছে, দ্বীনে তাঁদের মর্যাদার বিশালত্ব প্রসিদ্ধ আছে, তাঁদের কথা পূর্ববর্তী থেকে পরবর্তীরা গ্রহণ করেছে এবং যাঁরা 'বিদআতী' বলে সমালোচিত হননি অথবা অসন্তোষজনক কোন পদবী নিয়ে প্রসিদ্ধ হননি; যেমন খাওয়ারিজ, রাওয়াফিয, ক্বাদারিয়্যাহ, জাবারিয়্যাহ, মুর্জিয়াহ, জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা, কার্রামিয়্যাহ প্রভৃতি।'[৪৪]

([৪৩]) *দ্রঃ ওয়াসাত্বিয়্যাতু আহলিস সুন্নাতি বাইনাল ফিরাক্ব, ডঃ মুহাম্মাদ বাকারীম ৯৬-১০১পৃঃ, সামান্য হস্তক্ষেপ ক'রে। আর বইটি মূল্যবান।*

([৪৪]) *লাওয়ামিউল আনওয়ার ১/২০*

বলা বাহুল্য, উক্ত ইমাম সতর্কতার সাথে 'সলফ' শব্দের পাশাপাশি বিশেষণ যুক্ত করেছেন যে, যিনি হবেন অনুসরণীয়, যাঁর ইমামত প্রত্যয়িত, তিনি 'বিদআতী' বলে সমালোচিত নন। সুতরাং প্রত্যেক 'সলফ'ই অনুসরণীয় নয়। আসলে আদর্শ ও নমুনা হলেন সেই সকল শ্রেষ্ঠ সলফগণ; রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনদের ইমামগণ, যাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যয়িত, যাঁরা সুন্নাহর ধারক হিসাবে এবং তার ইমাম রূপে, বিদআত থেকে দূরে অবস্থানকারী ও তার ব্যাপারে সতর্ককারী রূপে পরিচিত।

আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবার পথ অবলম্বন করতে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং তাঁদের মানহাজ গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন।

তিনি বলেছেন,

((وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ)) (لقمان : ١٥)

"যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর।" *(লুক্বমান ঃ ১৫)*

ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'সাহাবাগণের প্রত্যেক সাহাবীই আল্লাহর অভিমুখী ছিলেন। সুতরাং তাঁর পথ অবলম্বন করা ওয়াজেব। আর তাঁর কথা ও আকীদা গ্রহণ করা তাঁর সবচেয়ে বড় পথসমূহের অন্যতম।[৪৫]

আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁদের প্রতিও সন্তুষ্ট, যাঁরা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করেছেন।

তিনি বলেছেন,

((وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)) (التوبة : ١٠٠)

"আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন, যার তলদেশে নদীমালা প্রবাহিত; যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, এ হল বিরাট সফলতা।" (তাওবাহ ঃ ১০০)

---

(৪৫) *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ৪/ ১২০*

সুতরাং আহলুস সুন্নাহর 'সালাফী' নাম গ্রহণ করা কোন ক্ষেত্রেই বিদআতের পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং 'সলফ' পরিভাষাটি 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র পরিভাষার সমভাবে সমান। আর সাহাবাগণের ক্ষেত্রে উভয় পরিভাষা একত্রিত হওয়া নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে এ কথা উপলব্ধ হয়। সুতরাং তাঁরাই হলেন সলফে সালেহীন এবং তাঁরাই হলেন আহলুস সুন্নাহ।[৪৬]

বলা বাহুল্য, যেমন আমাদের জন্য আহলুস সুন্নাহর দিকে সম্পর্ক জুড়ে 'সুন্নী' বলা সঠিক, তেমনি সালাফের প্রতি সম্পর্ক জুড়ে 'সালাফী' বলাও সঠিক; কোনও পার্থক্য নেই।

যখন বহু ফির্কা অস্তিত্বে এল এবং ফির্কাবন্দি সংঘটিত হল, তখন 'সলফ' শব্দের মর্মার্থ সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যে ব্যক্তি সাহাবা ও শ্রেষ্ঠ যুগের বুঝ অনুসারে আকীদা ও মানহাজকে সহীহ-শুদ্ধ রাখতে যত্নবান হবে। আর এই 'সলফ' পরিভাষাটি 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ'র অন্যান্য শরয়ী নামের সমার্থক হবে। যেমন এ কথা পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে।

২। সলফের মযহাব প্রকাশ করা এবং বিদআতীদের ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা

((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّيْنَ عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة)).

"তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত ক'রে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" *(আবু দাউদ ৪৬০৯, তিরমিযী ২৬৭৬, ইবনে মাজাহ ৪২নং)*

ফির্কাহ নাজিয়াহর গুণ বর্ণনায় তিনি বলেছেন,

((مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي)).

(৪৬) *দ্রঃ মাওক্বিফু আহলিস সুন্নাতি মিন আহলিল বিদা' ১/৬৩পৃঃ*

"আজ আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" *(তিরমিযী ২৬৪১, হাকেম ৪৪৪, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৪৮৮৬, স্বাগীর ৭২৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ (অথবা আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি কাউকে আদর্শ বানাতে চায়, সে যেন মৃতদেরকে নিজের আদর্শ বানায়। তাঁরা হলেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবা। তাঁরা এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ। হৃদয়ে সবচেয়ে সৎশীল, ইলমে সবচেয়ে সুগভীর ও 'তাকাল্লুফ' (কষ্টকল্পনায়) অতি কম। তাঁরা এমন এক সম্প্রদায়, যাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য এবং তাঁর দ্বীন বহনের জন্য মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের চরিত্র ও নিয়ম-নীতিতে সাদৃশ্য অবলম্বন কর। যেহেতু তাঁরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহচর। তাঁরা ছিলেন সরল সুপথের উপর।"[৪৭]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আমাদের নিকট সুন্নাহর মৌলনীতি হল, যে বিষয়ের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সে বিষয়কে ধারণ করা, তাঁদের অনুগমন করা এবং বিদআত বর্জন করা।'[৪৮]

প্রজন্মের পর প্রজন্ম সুন্নাহর ইমাম ও উলামাগণ সলফে সালেহীনের অনুসরণ করতে, তাঁদের অনুগমন করতে এবং তাঁদের পথ অবলম্বন করতে আহবান করে আসছেন। তাঁরা তাঁদের দ্বীন ও আকীদায় দলীলরূপে গ্রহণ করেন আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহীহ হাদীসকে, তাতে না পাওয়া গেলে সলফে সালেহীন, সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, যাঁরা সুন্নাহর ইমামরূপে প্রসিদ্ধ, তাঁদের প্রমাণিত আষারকে গ্রহণ করেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ)) (الأعراف : ٥٤)

"অতঃপর তিনি আরশে উঠলেন।"

মহান আল্লাহর এই বাণীর তফসীরে ইবনে কাষীর বলেন,

---

(৪৭) *হিল্‌য়াতুল আউলিয়া ১/৩০৫-৩০৬, শারহুস সুন্নাহ, বাগাবী ১/২১৪*

(৪৮) *শারহু উসূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ ১/১৫৬*

এ ব্যাপারে লোকেদের অনেকানেক বক্তব্য আছে, এ জায়গা তা বিস্তারিত বলার জন্য নয়। এ ক্ষেত্রে সলফে সালেহর মযহাব গ্রহণ করতে হবে; মালেক, আওযায়ী, সাওরী, লাইষ বিন সা'দ, শাফেয়ী, আহমাদ বিন হাম্বল---।'[৪৯]

(আকীদাহ) ত্বাহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যাতা ইমাম ইবনে আবিল ইয্য হানাফী বলেছেন, 'আমি পছন্দ করেছি যে, সলফদের উক্তির মাধ্যমে তাঁদের পথে চলে এর ব্যাখ্যা করব, অযাচিতভাবে তাঁদের (তাঁতযন্ত্রে ও) পদ্ধতিতেই আমি বয়ন করব, যাতে আমি তাঁদের সূত্রে গ্রথিত হতে পারি এবং তাঁদের দলে প্রবেশ করতে পারি।'[৫০]

ইমাম যাহাবী তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'আল-উলুউবু লিল আলিয়্যিল গাফ্ফার'-এ বলেন, 'আল্লাহর বান্দা! তুমি যদি ইনসাফ চাও, তাহলে কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট উক্তির কাছে থামো। তারপর তুমি দেখো, এই আয়াতসমূহের ব্যাপারে সাহাবা, তাবেঈন ও তফসীরের ইমামগণ কী বলেছেন এবং সলফের কী মতামত উদ্ধৃত করেছেন। অতঃপর তুমি ইলমের সাথে কথা বলবে, নচেৎ ধৈর্যের সাথে চুপ থাকবে।'[৫১]

আহলুস সুন্নাহর প্রয়োজন ছিল, সলফে সালেহর মযহাব প্রকাশ করা, যাঁদের ব্যাপারে কেউ সন্দেহ করতে পারে না যে, তাঁরাই হলেন আহলুস সুন্নাহ, সুন্নাহর মাধ্যমেই তাঁরা পরিচিত। তাঁরা তা প্রকাশ করার প্রয়োজন তখন মনে করলেন, যখন বিদআত ও মতভেদের শিং বের হল এবং ঐ দল ও ফির্কাসমূহ প্রাদুর্ভূত হল। আর ঐ সকল ফির্কা-ওয়ালারা মনে করতে লাগল যে, তারাই হকপন্থী, তারাই ফির্কাহ নাজিয়াহ। তারাও তাদের বক্তব্য ও মযহাবের সপক্ষে দলীল হিসাবে কিতাব ও সুন্নাহরই উক্তি ব্যবহার করতে লাগল। সেই সব উক্তিকে নিজেদের রায় অনুসারে প্রয়োগ করল এবং তার প্রকাশ্য অর্থ যা দাবী করে, তার বিকৃতি ঘটাল। দাবী করল, তারাই কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারী। এর ফলে হয়তো সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টির ব্যাপারে তালগোল পেকে গেল। এক্ষণে লোকেদের প্রয়োজন দেখা দিল সলফের মযহাব প্রকাশ ও বয়ান করার।

([৪৯]) *তফসীরে ইবনে কাষীর ২/৪২২*

([৫০]) *শারহু আক্বীদাতিত ত্বাহাবিয়্যাহ ৭৪পৃঃ*

([৫১]) *১৬ পৃঃ, পূর্বোক্ত বিষয়ে আরো দ্রঃ ওয়াসাত্বিয়্যাতু আহলিস সুন্নাতি বাইনাল ফিরাক্ব, ডঃ মুহাম্মাদ বাকারীম ১০২-১০৫পৃঃ*

এই জন্য আহলুল ইল্মগণ এ কথা স্পষ্ট করতে যত্নবান ছিলেন যে, তাঁরা যে আকীদার মাসায়েল উল্লেখ করেছেন বা বলেছেন, তা হল তাঁদের পূর্ববর্তী সলফদের ইমাম, সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনদের বক্তব্য। যাতে জানা যায় যে, এর বিরোধী কথা তাঁদের বক্তব্য নয় এবং তাঁদের পথ-নির্দেশনাও নয়। বরং তা হল বিদআত ও মতভেদ-ওয়ালাদের বক্তব্য।[৫২]

৩। সলফদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং 'সালাফী' উপাধি লাগানোর বৈধতা

এ কথা বিদিত যে, সলফের অনুসরণ করার দিকে অথবা সালাফিয়্যাতের দিকে আহবান, মূলতঃ তা হল প্রকৃত ইসলাম ও নিছক সুন্নাহর দিকে আহবান, হুবহু সেই ইসলামের দিকে ফিরে আসার আহবান, যে ইসলাম অবতীর্ণ হয়েছিল নবী ﷺ-এর উপর এবং যা তাঁর সাহাবীগণ ﷺ তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

নিঃসন্দেহে এই দাওয়াত (আহবান) হল হকের দাওয়াত। তার প্রতি সম্পর্ক জুড়াও হক।

সুন্নাহর প্রতি দাওয়াত দেওয়া, সলফের পথ ও মানহাজের দিকে ফিরে আসা এবং তাঁদের অনুগমন করার ব্যাপারে ইসলামের আহলুস সুন্নাহর ইমামগণের বিশাল প্রভাব ছিল। তাঁদের মধ্যে হলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইমাম, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম আবূ বাক্র মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুযাইমাহ, ইমাম আবূ বাক্র মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আ-জুর্রী, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বিন বাত্ত্বাহ উকবারী, ইমাম আবুল কাসেম ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আসবাহানী, অতঃপর শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ও তাঁর ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, অতঃপর শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ও তাঁর পরবর্তী দাওয়াতের ইমামগণ।

তাঁদের প্রভাবের ফলে ঐতিহাসিক কালক্রমে সালাফী গতিধারা প্রকাশ পায়। যার দ্বীন ও আকীদার মৌলিক বিষয় আহরণ করা হয় আল্লাহর কিতাব, তাঁর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ এবং শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রাথমিক তিন শতাব্দীর মানুষ,

---

(৫২) *ওয়াসাত্বিয়্যাতু আহলিস সুন্নাতি বাইনাল ফিরাক্ব, ডঃ মুহাম্মাদ বাকারীম ১০৫-১০৬পৃঃ, কিঞ্চিৎ হস্তক্ষেপ ক'রে।*

সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন, সলফে সালেহীনের জীবনী থেকে এবং মোকাবেলা করা হয় প্রত্যেক সেই বিদআতী স্রোতধারার, যা এই মৌলিক বুনিয়াদ থেকে বের হয়ে যায়।

এ কথা জানার পর আমরা শিরোনামের দিকে ফিরে যাই। অর্থাৎ, সলফের সাথে সম্পর্ক জুড়া এবং 'সালাফী' পদবী ব্যবহারের বৈধতার কথা।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সলফের মযহাব প্রকাশ করে, তাঁদের সাথে সম্পর্ক জোড়ে এবং তাঁদের প্রতি সম্পৃক্ত হয়, সে ব্যক্তির তাতে কোন দোষ হয় না। বরং তার নিকট থেকে সেটা গ্রহণ করা ওয়াজেব। যেহেতু সলফের মযহাব হক বৈ নয়।'[৫৩]

সামআনী 'আনসাব' গ্রন্থে (৩/২৭৩)তে বলেছেন, 'সালাফী'---সীন ও লামে যবর দিয়ে, যার শেষে রয়েছে ফা। এ হল সলফের দিকে সম্পর্ক জুড়া ও তাঁদের মতাদর্শ অবলম্বন করার শব্দ। যেমন আমি শুনেছি।

সামআনীর উক্ত কথার পশ্চাতে ইবনুল আষীর বলেছেন, 'আর এই নামে একটি জামাআত পরিচিত।'[৫৪]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ তাঁর রচিত কিছু গ্রন্থে 'সালাফী' উপাধি তাঁদের জন্য প্রয়োগ করেছেন, যাঁরা উচ্চ মর্যাদায় সলফের মতামত গ্রহণ করেন।[৫৫]

যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) 'সিয়ার' গ্রন্থে (১২/৩৮০)তে বলেছেন, 'হাফেযের প্রয়োজন হল পরহেযগার (সংযমী), স্মৃতিধর----সালাফী হওয়া।'

তিনি 'সিয়ার' গ্রন্থে (১৬/৪৫৭)তে দারাকুত্বনী (রাহিমাহুল্লাহ)র ব্যাপারে বলেছেন, 'উক্ত ব্যক্তি কখনই 'ইলমুল কালাম' ও 'জিদাল' (তর্কশাস্ত্র)-এ প্রবেশ করেননি, তাতে নিমগ্নও হননি, বরং তিনি 'সালাফী' ছিলেন।

আমি (লেখক) বলি, বর্তমান যুগে এই সম্পর্ক ও এই উপাধি প্রয়োগ করেছেন সম্মানিত উলামাগণ, যাঁরা সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা এবং তার প্রতিরক্ষা করার প্রসিদ্ধ। যেমন শায়খ আব্দুর রহমান মুআল্লিমী (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃঃ

---

(৫৩) *মাজমূউ ফাতাওয়া ৪/১৪৯*

(৫৪) *আল-লুবাব ফী তাহযীবিল আনসাব ২/১২৬*

(৫৫) *যেমন তিনি কিছু সংখ্যক উলামার জন্যও প্রয়োগ করেছেন। দ্রঃ বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ ১/১২২, দারউ তাআরুযিল আক্বলি ওয়ান নাক্বল ৭/১৩৪, ৭/২০৭*

১৩৮৬হিঃ তাঁর 'আল-ক্বাইদ ইলা তাস্বহীহিল আক্বাইদ' গ্রন্থে এবং শায়খ ইমাম আদর্শ আলেম আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'তানবীহাতুন হা-ম্মাহ আলা মা কাতাবাহু মুহাম্মাদ আলী আস-স্বাবূনী ফী স্বিফাতিল্লাহি আয্যা ওয়া জাল্ল' পুস্তিকায়।

শায়খ আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) কে প্রশ্ন করা হল, 'সেই ব্যক্তির ব্যাপারে আপনি কী বলবেন, যে নিজেকে 'সালাফী' বা 'আষারী' বলে পরিচয় দেয়? সেটা কি প্রশংসাসূচক?'

তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'সে যদি 'আষারী' বা 'সালাফী' হওয়াতে সত্যবাদী হয়, তাহলে কোন সমস্যা নেই। যেমন সলফগণ বলতেন, 'অমুক সালাফী', 'অমুক আষারী'। (পরিচয়ের ক্ষেত্রে) প্রশংসা আবশ্যক, প্রশংসা ওয়াজেব।'[৫৬]

শায়খ আলেম আল্লামাহ মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'মুখতাস্বারুল উলুউ' গ্রন্থে, 'শারহু আক্বীদাতিত ত্বাহাবিয়্যাহ'র ভূমিকায় এবং 'আত-তাওয়াস্সুল' গ্রন্থে (সালাফী শব্দ প্রয়োগ করেছেন)।

শায়খ আল্লামাহ স্বালেহ বিন ফাউযান আল-ফাউযান 'আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ' গ্রন্থের (১০৩পৃঃ)তে, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'সালাফিয়্যাহ' কী? তার মানহাজে চলা এবং তা আঁকড়ে ধরা কি ওয়াজেব?'

উত্তরে তিনি বলেছেন, 'সালাফিয়্যাহ হল, আকীদাতে, (কুরআন-সুন্নাহ) বুঝতে এবং চরিত্র-আচরণে সলফ তথা সাহাবা, তাবেঈন ও শ্রেষ্ঠ শতাব্দীগুলির (উলামাদের) মানহাজে চলার নাম। আর এই মানহাজে চলা মুসলিমের জন্য ওয়াজেব।'

তাঁদের মধ্যে সম্মানিত শায়খ আলী বিন নাসের ফাক্বীহী। তিনি তাঁর 'আল-ফাতহুল মুবীন বির্রাদ্দি আলা নাক্বদি আব্দিল্লাহ আল-গুমারী লিকিতাবিল আরবাঈন' গ্রন্থে (সালাফী শব্দ ব্যবহার করেছেন)।

বলা বাহুল্য, উক্ত সম্মানিত উলামাগণ এবং আরো অন্যান্যগণ 'সালাফী', 'সালাফিয়্যাহ' বা 'সালাফিয়্যুন' উপাধি প্রয়োগ করাতে কোন দোষ আছে বলে মনে করেননি। আর 'সালাফী' বলতে উদ্দেশ্য হল, সেই ব্যক্তি, যে সলফের মানহাজ ও তাঁদের তরীকায় চলমান। কিছু আধুনিক লেখক, যাঁরা ইসলামী

---

(৫৬) *ত্বায়েফ শহরে পরিবেশিত 'হাক্কুল মুসলিম' (মুসলিমের অধিকার) লেকচার থেকে।*

মযহাবসমূহ নিয়ে লিখেছেন, যেমন মুহাম্মাদ আবূ যুহরাহ, মুস্তাফা শাক্আহ, মুহাম্মাদ সাঈদ বূত্বী প্রমুখ, তাঁরা পূর্ববর্তী ইমামগণের অনুসরণে সালাফীদেরকে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী গণ্য করেছেন, যে গোষ্ঠী উক্ত নামে পরিচিত। তাঁরা ইঙ্গিত করেছেন যে, এই গোষ্ঠীর প্রগতিতে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ রয়েছে। আর তা আহমাদ বিন হাম্বলের মাদ্রাসা থেকে বিস্তারলাভ করেছে, যার নবায়ন হয়েছে ইবনে তাইমিয়্যাহ ও ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের যুগে। তাঁদের ধারণা, সালাফীরা নিজেরাই এই পদবী নিজেদের জন্য প্রয়োগ করেছেন।

তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সালাফী মতাদর্শকে একটি (ইসলামী) কালক্রম হিসাবে গণ্য করেছেন, ইসলামী মযহাব হিসাবে নয়; যেমন মুহাম্মাদ সাঈদ রমাযান বূত্বী।

'সালাফী মতাদর্শের দিকে ফিরে আসার আহবায়কগণ নিজেদের জন্য উক্ত পদবী প্রয়োগ ক'রে থাকুন অথবা অন্যেরা তাঁদের জন্য প্রয়োগ ক'রে থাকুন অতঃপর তাঁরা সেই নামে পরিচিত হন, সে যাই হোক না কেন, পূর্ববর্তী আহলুস সুন্নাহর কোন ইমাম অথবা আমাদের বর্তমান যুগের তাঁদের কোন অনুসারী থেকে এ কথা জানা যায়নি যে, তাঁদের কেউ সালাফীদের বিরুদ্ধে আপত্তি করেছেন অথবা নিজেদের জন্য তাঁদের উক্ত উপাধি ব্যবহারে প্রতিবাদ করেছেন। অন্ততঃপক্ষে বলা যায় যে, উক্ত উপাধি ব্যবহার করা ও তার সাথে সম্পর্ক জুড়া বৈধ। আর তা হল একটি পরিভাষা। আর পরিভাষায় কোন বিতর্ক নেই।[৫৭]

তারপর দেখার বিষয় প্রকৃততত্ব ও অর্থ, শব্দ নয়। আর ইতিপূর্বে একাধিক অর্থে বুঝা গেছে যে, (সালাফী) হল সেই ব্যক্তি, যে সলফে সালেহীনের মানহাজে চলে, তাঁদের তরীকা অনুসরণ করে। অতএব 'সালাফী' হোক অথবা 'আহলুস সুন্নাহ', উভয় নামকরণে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই---যেমন পূর্বে এ কথা উল্লিখিত হয়েছে।

---

(৫৭) *ওয়াসাত্বিয়্যাতু আহলিস সুন্নাতি বাইনাল ফিরাক্ব ১১১পৃঃ, কিঞ্চিৎ হস্তক্ষেপ ক'রে।*

৪। সলফে সালেহীনের অনুসরণ ও তাঁদের মতাদর্শ অবলম্বন করা অপরিহার্য হওয়ার কিছু দলীল

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ)) (لقمان : ١٥)

"যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর।" *(লুক্বমানঃ ১৫)*

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাদের পথ অনুসরণ করতে, তাঁদের আষার অনুগমন করতে এবং তাঁদের মানহাজ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'সাহাবাগণের প্রত্যেক সাহাবীই আল্লাহর অভিমুখী ছিলেন। সুতরাং তাঁর পথ অবলম্বন করা ওয়াজেব। আর তাঁর কথা ও আকীদা গ্রহণ করা তাঁর সবচেয়ে বড় পথসমূহের অন্যতম।'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে তাঁদের পথ ছেড়ে বিপরীত পথ ধরতে সতর্ক করেছেন এবং সে পথের বিরোধীদেরকে ধমকি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

((وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً)) (النساء : ١١٥)

"আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মু'মিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস!" (নিসা ঃ ১১৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাহাবাগণ ও নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসারিগণের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাঁদের জন্য বিশাল সওয়াব প্রস্তুত রেখেছেন, সে কথা তিনি আমাদেরকে বলেছেন,

((وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)) (التوبة : ١٠٠)

"আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন, যার তলদেশে নদীমালা প্রবাহিত; যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, এ হল বিরাট সফলতা।" (তাওবাহ ঃ ১০০)

যেমন তিনি সেই ব্যক্তিকে জাহান্নামের আযাবের ধমকি দিয়েছেন, যে ব্যক্তি তাঁদের পথ ছাড়া অন্য পথের অনুসরণ করে। তেমনি তিনি তাকে জান্নাত ও সন্তুষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে তাঁদের পথ অবলম্বন করে।

আর নবী ﷺ নিজ উম্মতকে তাঁর সুন্নাহ ও তাঁর পরবর্তী খুলাফার সুন্নাহর অনুসরণ করতে আদেশ দিয়ে বলেছেন,

« فإنَّه مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ».

"---তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে জীবিত থাকবে, সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সুন্নাহ (পথ ও আদর্শ) এবং আমার পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো। তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, দাঁতে কামড়ে ধরো। আর দ্বীনে নবরচিত কর্ম থেকে সাবধান থেকো। কারণ প্রত্যেক নবরচিত (দ্বীনী) কর্মই হল 'বিদআত'। আর প্রত্যেক বিদআতই হল ভ্রষ্টতা।" *(আহমাদ ১৭১৪৪, আবূ দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৮১৫ নং, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১৬৫নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ লোক আমার শতাব্দীর লোক। অতঃপর তাদের পরবর্তীরা। অতঃপর তাদের পরবর্তীরা। *(বুখারী ২৬৫২, মুসলিম ৬৬৩৫নং)*

ফির্কাবন্দির হাদীসে তিনি 'ফির্কাহ নাজিয়াহ'র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ক'রে বলেছেন,

((مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي)).

"আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" *(তিরমিযী ২৬৪১, হাকেম ৪৪৪, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৪৮৮৬, স্বাগীর ৭২৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি সেই মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যার উপর তাঁরা ছিলেন, সে ব্যক্তি 'ফির্কাহ নাজিয়াহ'র দলভুক্ত হবে, আর যে তাঁদের বিরোধিতা করবে এবং তাঁদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করবে, সে ধমকিপ্রাপ্তদের দলভুক্ত হবে।

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, "তোমরা অনুসরণ কর, নতুন কিছু (বিদআত) রচনা করো না। কারণ তোমাদের জন্য তাই যথেষ্ট। আর তোমরা পুরাতন পন্থাই অবলম্বন কর।" *(সহীহ, সিলসিলা যয়ীফাহ ২/১৯)*

তিনি আরো বলেছেন, 'আমরা অনুগমন করব, সূচনা করব না। অনুসরণ করব, রচনা করব না। আর কখনই ভ্রষ্ট হব না, যতদিন আষার আঁকড়ে ধরে থাকব।'

উবাই বিন কা'ব ﷺ বলেছেন, 'তোমরা (আল্লাহর) পথ ও সুন্নাহ অবলম্বন করো। যেহেতু কোন বান্দা পথ ও সুন্নাহর উপরে থেকে রহমানকে স্মরণ ক'রে তাঁর ভয়ে তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুবিগলিত হলে, তাকে কোন দিনই জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। পথ ও সুন্নাহতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা পথ ও সুন্নাহর পরিপন্থী অনেক আমল করার চাইতে উত্তম।'

আবুল আলিয়াহ বলেছেন, 'তোমরা প্রথম বিষয় অবলম্বন করো, যাতে লোকেরা নানা ফির্কায় বিভক্ত হওয়ার পূর্বে ছিল।'

আওযাঈ বলেছেন, 'তুমি সুন্নাহকে ধৈর্যের সাথে ধারণ করো। সেখানে থামো, যেখানে সম্প্রদায় থেমেছে। তাই বলো, যা তাঁরা বলেছেন। সেই জিনিস থেকে বিরত থাকো, যে জিনিস থেকে তাঁরা বিরত থেকেছেন। তুমি তোমার সলফে সালেহর পথ অবলম্বন করো। যেহেতু তাই তোমার জন্য প্রশস্ত, যা তাঁদের জন্য প্রশস্ত ছিল।'

তিনি আরো বলেছেন, 'তুমি সলফের আষার অবলম্বন করো; যদিও লোকে তোমাকে বর্জন করে। আর লোকেদের মতামত থেকে দূরে থাকো; যদিও তা তারা তোমার নিকট সুশোভিত ক'রে পেশ করে।'

ইমাম আহমাদ বলেন, 'আমাদের নিকট সুন্নাহর মৌলনীতি হল, যে বিষয়ের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সে বিষয়কে ধারণ করা, তাঁদের অনুগমন করা এবং বিদআত বর্জন করা।'

প্রজন্মের পর প্রজন্ম সুন্নাহর ইমাম ও উলামাগণ সলফে সালেহীনের অনুসরণ করতে, তাঁদের অনুগমন করতে, তাঁদের পথ অবলম্বন করতে এবং তাঁদের আষার অনুরসণ করতে আহবান ক'রে আসছেন।

৫। আকীদাতে সলফের মানহাজ

তাঁদের মানহাজের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ-

১। আকীদার ক্ষেত্রে তাঁদের গ্রহণের উৎস হিসাবে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহকে সীমিত করা এবং তার বক্তব্যকে সলফে সালেহর বুঝ অনুসারে বুঝা।

২। আকীদার ক্ষেত্রে সহীহ সুন্নাহকে দলীলরূপে গ্রহণ করা, চাহে তা মুতাওয়াতির হোক অথবা খবরে ওয়াহেদ।

৩। ওয়াহীতে যা এসেছে, তা মেনে নেওয়া, তা আক্ল (জ্ঞান-বিবেক) দ্বারা রদ্দ না করা এবং গায়বী কোন বিষয়ে নিমগ্ন না হওয়া, যাতে জ্ঞান-বুদ্ধির কোন অবকাশ নেই।

৪। ইলমুল কালাম ও ফালসাফা (থিওলজি ও ফিলসফি)তে ব্রতী না হওয়া।

৫। বাতিল ব্যাখ্যা (অপব্যাখ্যা) বর্জন করা।

৬। একই বিষয়ে বিভিন্ন উক্তিকে একত্র করা।[৫৮]

এই আকীদা নির্মল ঝরনা; আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহ থেকে সংগৃহীত, যা (মানব মনের) খেয়ালখুশি ও সংশয় থেকে দূরস্থিত। এই

([৫৮]) *উল্লিখিত কথাগুলি সম্মানিত শায়খ আব্দুল্লাহ উবাইলানের 'দুরূস ফিল মানহাজ'-এর সারাংশ। আর আকীদায় সলফের মানহাজ নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করলে তা জানা যায়।*

আকীদার ধারক হবে কিতাব ও সুন্নাহর উক্তিকে শ্রদ্ধাকারী। যেহেতু সে জানে যে, তাতে যা আছে, তা হক ও সঠিক।

ইমাম বার্বাহারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আল্লাহ তোমাকে রহম করুন, জেনে রাখো যে, দ্বীন আগত হয়েছে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার নিকট থেকেই। তা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও রায়ের উপর ন্যস্ত করা হয়নি। তার ইল্‌ম আছে আল্লাহর নিকট ও তাঁর রসূলের নিকট। সুতরাং তোমার নিজ খেয়ালখুশি মতে কোন কিছুর অনুসরণ করো না। নচেৎ তুমি দ্বীন ভেদ ক'রে যাবে এবং ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। তোমার নিকট কোন প্রমাণ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ উম্মতের জন্য সুন্নাহ বয়ান ক'রে দিয়েছেন এবং তাঁর সাহাবীগণের নিকট স্পষ্ট ক'রে দিয়েছেন। তাঁরাই হলেন জামাআত। তাঁরাই হলেন বৃহত্তম জামাআত। আর বৃহত্তম জামাআত হল হক ও তার অনুসারী।'[৫৯]

এ কথার পূর্বে (৬৫ পৃষ্ঠায়) তিনি বলেছেন, 'যে ভিত্তির উপর জামাআত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, তা হল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবাগণ। তাঁরাই হলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁদের নিকট থেকে (ইল্‌ম) গ্রহণ করবে না, সে ব্যক্তি হবে ভ্রষ্ট ও বিদআতী। আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা---।'

তিনি (বার্বাহারী) আরো বলেছেন, 'উমার বিন খাত্ত্বাব বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সুপথ ধারণা ক'রে কোন ভ্রষ্টতায় সওয়ার হয়েছে অথবা ভ্রষ্টতা ধারণা ক'রে কোন সুপথ বর্জন করেছে, সে ব্যক্তির তাতে কোন ওজর নেই। যেহেতু সকল বিষয় বিবৃত হয়েছে। হুজ্জত কায়েম হয়ে গেছে। ওজর দূর হয়ে গেছে। আর তা এইভাবে যে, সুন্নাহ ও জামাআত পুরো দ্বীনকে মজবুত ক'রে দিয়েছে। মানুষের নিকট তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং লোকেদের কর্তব্য হল, (তার) অনুসরণ করা।'[৬০]

([৫৯]) *শারহুস সুন্নাহ ৬৬পৃঃ*
([৬০]) *ঐ ৬৬পৃঃ*

সালাফী মানহাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলী

আমি (লেখক) বলি, সুতরাং সালাফী মানহাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলীর কতিপয় নিম্নরূপ ঃ-

১। তার অনুসারীরা হকের উপর অবিচল থাকে। তারা পাল্টাতে থাকে না; যেমন খেয়ালখুশির পূজারীদের অভ্যাস।

একদা হুযাইফা আবূ মাসঊদকে বলেছিলেন, 'প্রকৃত ভ্রষ্টতা ও গুমরাহি এই যে, আজ যাকে তুমি ভালো ও হক বলে জানছ, কাল তাকেই মন্দ ও বাতিল গণ্য করতে লাগবে এবং আজ যাকে মন্দ বলছ, কাল তাকেই ভালো গণ্য করতে লাগবে।

وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ.

'তুমি বহুরূপী হওয়া থেকে দূরে থাকো, কারণ আল্লাহর দ্বীন অদ্বিতীয়।'[৬১]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, 'মোটের উপর আহলুল হাদীস ওয়াস সুন্নাহর মধ্যে অটলতা ও অবিচলতা আহলুল কালাম ও ফালসাফা-ওয়ালাদের যতটুকু আছে, তার বহুগুণ বেশি।[৬২]

তিনি আরো বলেন, 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মুসলিম জনসাধারণ ও উলামার নিকট যে জ্ঞান, প্রত্যয়, প্রশান্তি, হকের ব্যাপারে দৃঢ়তা, সুপ্রতিষ্ঠিত বাণী এবং যার উপর তাঁরা প্রতিষ্ঠিত, তার ব্যাপারে তাঁদের নিশ্চয়তা---এ সব এমন বিষয়, যা অবিসংবাদিত। অবশ্য আল্লাহ যার জ্ঞানবুদ্ধি ও দ্বীন কেড়ে নিয়েছেন, তার কথা স্বতন্ত্র।'[৬৩]

২। তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটাও যে, তার অনুসারীরা আকীদার বিষয়ে একমত। কাল ও স্থানভেদে তাঁরা মতভেদগ্রস্ত নন।[৬৪]

৩। নবী ﷺ-এর নানা অবস্থা, তাঁর কর্ম ও বাণীসমূহের ব্যাপারে তাঁরাই সবার চাইতে বেশি অভিজ্ঞ। (হাদীসের) যয়ীফ থেকে সহীহকে পার্থক্য করার জ্ঞানে তাঁরাই সবার চাইতে বেশি বড়। সুতরাং তাঁরাই সুন্নাহর ভালোবাসার ক্ষেত্রে সবার চাইতে

---

(৬১) *বাইহাক্বী ২০৩৮৯, আঃ রাযযাক ২০৪৫৪নং*
(৬২) *মাজমূউল ফাতাওয়া ৪/৫১*
(৬৩) *মাজমূউল ফাতাওয়া ৪/১৯*
(৬৪) *দ্রঃ আল-হুজ্জাহ লিক্বিওয়ামিস সুন্নাহ ২/২২৫*

বেশি সুদৃঢ়। সুন্নাহর অনুসরণে তাঁরাই সবার চাইতে বেশি যত্নবান এবং সুন্নাহর অনুসারীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে তাঁরাই সবার চাইতে বেশি আগ্রহী।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যখন রসূল ﷺ সৃষ্টির সেরা পূর্ণ (মানব) ছিলেন, সৃষ্টির সবার চাইতে বেশি প্রকৃতত্ব বিষয়ের জ্ঞানী ছিলেন এবং কথা ও অবস্থায় শ্রেষ্ঠতম (মানব) ছিলেন, তখন আবশ্যিকভাবে তাঁর ব্যাপারে সবার চাইতে বেশি জ্ঞানী হবেন (সে ব্যাপারে) সৃষ্টির সেরা জ্ঞানী এবং তাঁর সবার চাইতে বেশি মান্যকারী ও অনুগামী হবেন সৃষ্টির সেরা মর্যাদাবান।'(৬৫)

৪। তাঁরা এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, সলফে সালেহর তরীকাই হল সবচেয়ে নিরাপদ, সবচেয়ে জ্ঞানগর্ভ এবং সবচেয়ে সুদৃঢ়। তেমন নয়, যেমন আহলুল কালাম দাবী ক'রে বলে, 'সলফের তরীকা সবচেয়ে নিরাপদ এবং খলফের (পরবর্তীদের) তরীকা সবচেয়ে জ্ঞানগর্ভ ও সুদৃঢ়।'

অবশ্য উক্ত অপবাদের জবাব দিয়েছেন শায়খুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, 'নিশ্চিতরূপে তারা সলফের তরীকার ব্যাপারে মিথ্যা বলেছে এবং খলফের তরীকাকে সঠিক বলতে গিয়ে ভ্রষ্ট হয়েছে। সুতরাং তারা মিথ্যা বলার মাধ্যমে সলফের তরীকা সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং খলফের তরীকাকে সঠিক প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতাকে একত্রিত করেছে।'(৬৬)

৫। তাঁদের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হল, সহীহ আকীদা ও সঠিক দ্বীন প্রচারে, মানুষকে শিক্ষাদান ও তাদের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষিতার ব্যাপারে এবং বিরোধী ও বিদআতীদের খন্ডন করার ব্যাপারে তাঁরা আগ্রহশীল।

৬। তাঁরা সকল ফির্কার মধ্যে মধ্যপন্থী।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছেন, 'ইসলাম (ধর্মে) আহলুস সুন্নাহ হল, (অন্যান্য) ধর্মসমূহের মধ্যে ইসলাম অবলম্বীদের মতো।'(৬৭)

তিনি আরো বলেছেন, 'সুতরাং তাঁরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নামাবলীর ক্ষেত্রে আহলুত তা'ত্বীল (নিষ্ক্রিয়কারী) জাহমিয়্যাহ এবং আহলুত তামযীল (সদৃশ স্থাপনকারী) মুশাব্বিহাহর মাঝে মধ্যপন্থী।

---

(৬৫) *মাজমূউল ফাতাওয়া ৪/ ১৪০-১৪১*
(৬৬) *মাজমূউল ফাতাওয়া ৫/৯*
(৬৭) *ঐ ৩/ ১৪১*

তাঁরা আল্লাহ তাআলার কর্মাবলীর ব্যাপারে ক্বাদারিয়্যাহ ও জাবারিয়্যাহর মাঝে মধ্যপন্থী।

তাঁরা (মহান আল্লাহর) ধমকির ক্ষেত্রে মুর্জিয়াহ এবং ক্বাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ভুক্ত ওয়াঈদিয়্যাহ প্রভৃতির মাঝে মধ্যপন্থী।

তাঁরা ঈমান ও দ্বীনের নামাবলীর ক্ষেত্রে হারূরিয়্যাহ ও মু'তাযিলাহ এবং মুর্জিয়াহ ও জাহমিয়্যাহর মাঝে মধ্যপন্থী।

এবং তাঁরা নবী ﷺ-এর সাহাবাদের ক্ষেত্রে রাওয়াফিয এবং খাওয়ারিজের মাঝে মধ্যপন্থী।'[৬৮]

৬। বিদআতী ও প্রবৃত্তিপূজারীদের মানহাজ

ইতিপূর্বে আকীদায় সলফের মানহাজ ও তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লিখিত হয়েছে এবং (বলা হয়েছে যে,) সালাফী মানহাজের পার্থক্যসূচক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আকীদার ক্ষেত্রে তাঁদের গ্রহণের উৎস হিসাবে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহকে সীমিত করা এবং তার বক্তব্যকে সলফে সালেহর বুঝ অনুসারে বুঝা।

ঠিক এরই বিপরীত হল খেয়ালখুশির পূজারী বিদআতীদের মানহাজ। সুতরাং তাদের গ্রহণের উৎস কিতাব ও সুন্নাহ নয়। তাদের উৎস হল, তাদের ইমাম ও শায়খগণের উদ্ভাবিত বিষয়। অতঃপর নিজেদের খেয়ালখুশি মোতাবেক কুরআন অথবা সুন্নাহর অপব্যাখ্যা। তাদের ভরসা হল জ্ঞান-বিবেক এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আরোপিত মিথ্যা ও দুর্বল-জাল হাদীস। তারা দ্ব্যর্থবোধক উক্তির অনুসরণ করে। দলীল হেরফের করে এবং তার অপব্যাখ্যা করে।

ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মোটকথা, আহলে কিতাবের ফির্কাবন্দি এবং এই উম্মতের ৭৩ ফির্কায় বিভক্ত হওয়ার কারণ ছিল (শরয়ী উক্তির) অপব্যাখ্যা।'[৬৯]

([৬৮]) *মাজমূউল ফাতাওয়া ৩/১৪১, দ্রঃ ওয়াসাত্বিয়াতু আহলিস সুন্নাতি বাইনাল ফিরাক্ব ২৩৫পৃঃ ও তার পরবর্তী পৃঃ, শায়খ আব্দুল্লাহ উবাইলানের 'দুরূস ফিল মানহাজ' ৭০-৭৩পৃঃ*

ইবনে আবিল ইয্য হানাফী বলেছেন, 'খাওয়ারিজের প্রাদুর্ভাব, মু'তাযিলার ই'তিযাল (পৃথক হওয়া), রাওয়াফিযের রফয্ (বর্জন করা) এবং উম্মাহর ৭৩ দলে বিভক্ত হওয়ার ঘটনা ভ্রান্ত অপব্যাখ্যা ব্যতীত কি অন্য কারণে ঘটেছে?'[৭০]

বলা বাহুল্য, খেয়ালখুশীর পূজারী বিদআতীরা যে এই মানহাজ অবলম্বন করেছে, তা যুক্তি ও প্রমাণে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মানহাজ-বিরোধী। আর সেটাই হল ইসলামী উম্মাহর ফির্কাবন্দির সবচেয়ে বড় কারণ।

৭। মুক্তি ও পরিত্রাণের উপায়ঃ অনুসরণ করা এবং বিদআত বর্জন করা

শায়খুল ইসলাম 'উবূদিয়্যাহ' গ্রন্থে বলেছেন, 'দ্বীনের মিলনক্ষেত্র হল দুটি মৌলনীতি ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না এবং তিনি যা বিধিবদ্ধ করেছেন, তা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাঁর ইবাদত করব না।'[৭১]

বিদআত দিয়ে তাঁর ইবাদত করব না। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

((فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً))

(الكهف : ١١٠)

"সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।" *(কাহফঃ ১১০)*

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমাদের আমল যেন স্বালেহ বা নেক হয়, অর্থাৎ তা যেন সুন্নাহর মোতাবেক হয়। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমলকারী যেন তা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে।

হাফেয ইবনে কাষীর তাঁর তফসীরে বলেছেন, 'এ হল কবুলযোগ্য আমলের দুটি রুকন (খুঁটি)। তা যেন আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীয়ত মোতাবেক হয়।'[৭২]

([৬৯]) *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ৪/৩১৭*

([৭০]) *শারহু আক্বীদাতিত ত্বাহাবিয়্যাহ ১৮৯পৃঃ*

([৭১]) *আল-উবূদিয়্যাহ ৩১পৃঃ*

এই শ্রেণীর কথা কাযী ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল যে, আমরা যে আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাই, তা সঠিক ও শুদ্ধ হওয়ার জন্য দুটি মৌলিক শর্ত পালন হওয়া জরুরী। আর সে দুটি একই সাথে সমবেত হতে হবে। একটি অন্য থেকে ছিন্ন হলে হবে না।

এক ঃ একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত বিশুদ্ধ হওয়া। (ইখলাস)

দুই ঃ তাতে কেবল তাঁর রসূল ﷺ-এর অনুসরণ করা। (তরীকায়ে মুহাম্মাদী)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ)) (الزمر : ٢)

"সুতরাং তুমি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁর উপাসনা কর।" (যুমার ঃ ২)

((وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ)) (القصص : ٧٧)

"আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার মাধ্যমে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। আর তুমি তোমার ইহলোকের অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি (পরের প্রতি) অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।" (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৭৭)

নবী ﷺ নিজ প্রতিপালকের নিকট থেকে বর্ণনা ক'রে (হাদীস কুদসীতে) বলেছেন,

((قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ)) .

'মহান আল্লাহ বলেন, "আমি সমস্ত অংশীদারদের চাইতে অংশীদারি (শির্ক) থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারি (শির্ক) সহ বর্জন করি।" (অর্থাৎ তার আমলই নষ্ট করে দিই।)' *(মুসলিম ৭৬৬৬নং)*

(৭২) *তফসীর ইবনে কাষীর ৩/ ১০৬*

বলা বাহুল্য, শির্কের সাথে, রিয়া (লোকপ্রদর্শনে)র সাথে অথবা মানুষের আমল দ্বারা দুনিয়ালাভের ইচ্ছার সাথে ইখলাস সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জরুরী এই যে, আমলকারী যেন নিজ আমলের মাধ্যমে এককভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশ্য রাখে।

এ হল প্রথম শর্ত বিষয়ক কথা। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শর্তের অর্থ হল, আমরা যে আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশা রাখি, তা যেন সেই শরীয়ত অনুযায়ী হয়, যা তিনি নিজ কিতাবে অথবা তাঁর রসূল ﷺ নিজ সুন্নাহতে বিধিবদ্ধ করেছেন।[৭৩]

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً)) (المائدة : ٣)

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।" (মায়িদাহ ঃ ৩)

সুতরাং আল্লাহ আমাদের দ্বীনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বোচ্চ বন্ধুর প্রতি ইন্তিকালের পূর্বেই পূর্ণাঙ্গ ক'রে দিয়েছেন। অতএব এমন কারো প্রয়োজন নেই, যে তাতে সংযোজন করবে বা বিয়োজন করবে।

(কুরআন-সুন্নাহতে) বহু উক্তি আছে, যা (উভয়ের) অনুসরণ করতে আদেশ দেয় এবং দ্বীনে বিদআত রচনা করতে সাবধান করে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً)) (الأحزاب : ٢١)

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (আহযাব ঃ ২১)

---

(৭৩) *মুযাক্কিরাহ ফিল আক্বীদাহ, ডঃ স্বালেহ বিন সা'দ সুহাইমী ১০পৃঃ*

((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) (الحشر : ٧)

"রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।" (হাশ্‌র ঃ ৭)

((قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ))

(آل عمران : ٣١)

"বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *(আলে ইমরান ঃ ৩১)*

((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّيْنَ عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة)).

"তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত ক'রে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" *(আবু দাউদ ৪৬০৯, তিরমিযী ২৬৭৬, ইবনে মাজাহ ৪২নং)*

আর নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে, "আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে (নিয়ে যায়)।" *(১৫৭৮নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((تَرَكْتُ فيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُما كِتابَ الله وسُنَّتي)).

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা অবলম্বন করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ।" *(মুওয়াত্ত্বা ১৫৯৪, হাকেম ৩১৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيهِ أمرُنا فَهُوَ رَدٌّ)).

"যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই তা বর্জনীয়।" *(বুখারী বিনা সনদে, মুসলিম ৪৫৯০নং)*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উম্মতকে জামাআত ও ঐক্যবদ্ধ হতে আদেশ দিয়েছেন। আর যেন এই ঐক্যের ভিত্তি হয় আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। পরন্তু তিনি দলেদলে বিভক্ত হতে নিষেধ করেছেন এবং উম্মতের জন্য তার ভয়াবহতা বিবৃত করেছেন। আর যাতে এই আদেশ ও নিষেধ বাস্তবে রূপ লাভ করে, তার জন্য তিনি আমাদেরকে (শরীয়তের) মুখ্য ও গৌণ বিষয়ে তাঁর কিতাবকে ফায়সালাদাতা হিসাবে মানতে আদেশ করেছেন এবং এমন সকল প্রকার কারণ ঘটাতে নিষেধ করেছেন, যা বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতার দিকে পৌঁছে দেয়।[৭৪]

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ)) (آل عمران : ١٠٣)

"তোমরা সকলে আল্লাহর রশিকে শক্ত ক'রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (আলে ইমরান ঃ ১০৩)

আর আল্লাহর রশি হল, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, তা হল কুরআন; যেমন মুফাস্সিরগণ বলেছেন। উক্ত আয়াতে আল্লাহ জামাআতবদ্ধ হয়ে থাকতে আদেশ এবং দলেদলে বিভক্ত হতে ও মতভেদ করতে নিষেধ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)) (الحشر : ٧)

"রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক।" (হাশ্র ঃ ৭)

এ নির্দেশ দ্বীনের মুখ্য ও গৌণ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ে শামিল। সুতরাং রসূল ﷺ যা নিয়ে আগমন করেছেন, তা গ্রহণ করা ও তার অনুসরণ করা বান্দার জন্য অপরিহার্য এবং তাঁর বিরোধিতা করা অবৈধ। আর কোন বিধান বিষয়ক তাঁর উক্তি মহান আল্লাহর উক্তির মতো। কারো জন্য তা বর্জন করার অবকাশ নেই এবং তাঁর কথার উপর অন্য কারো কথাকে অগ্রাধিকার দেওয়া বৈধ নয়।[৭৫]

মহান আল্লাহ বলেছেন,

---

(৭৪) *দ্রঃ উসূলুল ঈমান ফী য়্যাওইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ ২৯৩পৃঃ*

(৭৫) *উসূলুল ঈমান ২৯৪-২৯৫পৃঃ*

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ)) (الأنفال ٢٠)

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য কর এবং (তার কথা) শ্রবণ করার পরেও তার (আনুগত্য) হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।" *(আনফাল ঃ ২০)*

কলহ-বিবাদের সময় আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর কিতাব ও তাঁর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহর দিকে রুজু করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন,

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)) (النساء : ٥٩)

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" (নিসা ঃ ৫৯)

ইবনে কাষীর বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর অনুগত হও" অর্থাৎ, তাঁর কিতাবের অনুগামী হও।

"রসূলের অনুগত হও" অর্থাৎ, (তাঁর সুন্নাহ গ্রহণ করো, তার মানে) তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ করো।

"তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও" অর্থাৎ, তাঁদের আল্লাহর আনুগত্য বিষয়ক আদেশে; আল্লাহর অবাধ্যাচরণ বিষয়ক আদেশে নয়। যেহেতু 'স্রষ্টার অবাধ্যাচরণ ক'রে কোন সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়।'

"আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও" অর্থাৎ, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহর প্রতি রুজু করো।

এই হল মহান আল্লাহর আদেশ যে, প্রত্যেক সেই বিষয়, যাতে লোকেরা মতভেদ করে, চাহে তা দ্বীনের মুখ্য বিষয় হোক বা গৌণ বিষয়, সে মতভেদপূর্ণ বিষয়কে কিতাব ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।[৭৬]

([৭৬]) *উসূলুল ঈমান ২৯৪পৃঃ*

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

((وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ)) (الشورى : ١٠)

"তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন -- ওর মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট।" (শূরা ঃ ১০)

বলা বাহুল্য, কিতাব ও সুন্নাহ যার ফায়সালা দিয়েছে এবং সঠিকতার সাক্ষ্য দিয়েছে, সেটাই হল হক। আর 'হকের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছু নেই।'

মহান আল্লাহ বলেছেন, "যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর" অর্থাৎ, কলহ-বিতর্ক ও অজ্ঞতার সময়ে তোমরা ফায়সালার জন্য কিতাব ও সুন্নাহর প্রতি রুজু করো। আর এ ব্যাপারে যে ব্যক্তি তার প্রতি রুজু করে না, সে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী নয়।

এ ছাড়া আল্লাহ দলাদলির নিন্দা করেছেন। বিভিন্ন পথ ও তার দিকে পৌঁছে দেয় এমন কারণসমূহ থেকে নিষেধ করেছেন। যেহেতু তা হল দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ও আখেরাতে আযাবের অন্যতম বড় কারণ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) (آل عمران : ١٠٥-١٠٧)

"তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

সেদিন কতকগুলো মুখমন্ডল সাদা (উজ্জ্বল) হবে এবং কতকগুলো মুখমন্ডল কালো হবে। যাদের মুখমন্ডল কালো হবে (তাদেরকে বলা হবে), বিশ্বাসের পর কি তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে? সুতরাং তোমরা অবিশ্বাস করার পরিণামে শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর।

আর যাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বলবর্ণ হবে, তারা আল্লাহর করুণায় অবস্থান করবে। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।" (আলে ইমরান ঃ ১০৫-১০৭)

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মুখমন্ডল সাদা হবে এবং বিদআতী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুখমন্ডল কালো হবে।'[৭৭]

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ)) (الأنعام : ١٥٩)

"অবশ্যই যারা নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। তিনিই তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে অবহিত করবেন।" (আন্আম ঃ ১৫৯)

নবী ﷺ বলেছেন,

((افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)). قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : ((الجماعة)).

"ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিষ্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব ক'টি জাহান্নামে যাবে।" অতঃপর ঐ একটি দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "তারা হল জামাআত।"

সুতরাং নবী ﷺ জানিয়েছেন যে, তাঁর উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। ৭২টি দল জাহান্নামে যাবে এবং একটি দল জান্নাতে। সেই একক দল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

((ما أنا عليه وأصحابي)).

(সেই দল) "আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি, তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" *(সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

পূর্ববর্তী উম্মতেরা ধ্বংসের শিকার হয়েছে নানা কারণে। তবে তার মধ্যে অন্যতম কারণ হল, দলে দলে বিচ্ছিন্নতা ও অনেকানেক মতভেদ; বিশেষ

(৭৭) *শারহু উসূলিস সুন্নাহ, লালকাঈ ১/৭২*

ক'রে তাঁদের জন্য অবতীর্ণ কিতাব বিষয়ক মতভেদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক ক'রে বলেছেন,

((دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ واخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)).

"আমি যে ব্যাপারে তোমাদেরকে (বর্ণনা না দিয়ে) ছেড়ে দিয়েছি, সে ব্যাপারে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ, সে ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করো না)। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অধিক প্রশ্ন করার এবং তাদের নবীদের বিরোধিতা করার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন জিনিস থেকে নিষেধ করব, তখন তোমরা তা হতে দূরে থাক। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন কর।" *(বুখারী ৭২৮৮, মুসলিম ৩৩২ ১নং)*

বলা বাহুল্য, ফির্কাবন্দি ও মতভেদ থেকে পরিত্রাণের পথ হল ফির্কাহ নাজিয়াহ মানসূরাহর পথ অবলম্বন করা। আর সেটাই হল (হাদীসে উল্লিখিত) জামাআত। তাঁরাই নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণের মানহাজ অনুসারে চলেন এবং সে মানহাজ থেকে সরে যান না, এড়িয়ে চলেন না। মুক্তির পথ হল কথা, কাজ ও বিশ্বাসে সলফে সালেহর অনুসরণ করা এবং তাঁদের বিরোধিতা না করা ও তাঁদের নিকট থেকে সরে একাকিত্বের পথ অবলম্বন না করা।[৭৮]

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً)) (النساء : ١١٥)

"আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মু'মিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস!" (নিসা ঃ ১১৫)

---

(৭৮) *দ্রঃ উসূলুল ঈমান ফী য়াওইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ ৩০১ ও তার পরবর্তী পৃঃ, সামান্য হেরফের ক'রে উদ্ধৃত।*

সুতরাং মু'মিনদের পথ অনুসরণ করাই হল মুক্তির পথ। আর মু'মিনীন হলেন, সাহাবা, তাবেঈন, সুপথপ্রাপ্ত ইমামগণ এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসারিগণ।[৭৯]

পূর্বোক্ত কুরআন-সুন্নাহর বাণীর সারমর্মে বলা যায় যে, অনুসরণ সঠিক হবে তিনটি বিষয় পালনের মাধ্যমে। আর সে তিনটি বিষয় হল নিম্নরূপ ঃ-

১। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা।

২। কিতাব ও সুন্নাহর ব্যাপারে মতভেদ ও বিভক্তি সৃষ্টি না করা।

৩। কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ করা সলফে সালেহর বুঝ অনুসারে, তাঁদের ছাড়া অন্য কারো বুঝ অনুসারে নয়।

আর অনুসরণের জন্য আবশ্যিক বিষয় হল, আল্লাহর দ্বীনে বিদআত বর্জন করা। ইতিপূর্বে এক গুচ্ছ কিতাব ও সুন্নাহর বাণী উল্লিখিত হয়েছে, যাতে অনুসরণ করার আদেশ এবং বিদআত থেকে সাবধান হওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

যাঁরা সুন্নাহর ধারক ও বাহক, তাঁদেরকে নবী ﷺ সবচেয়ে বড় সুসংবাদ দান করেছেন, সবচেয়ে বড় অভীষ্ট লাভের শুভ সংবাদ দিয়েছেন, যে অভীষ্ট লাভ করতে চায় প্রত্যেক মু'মিন এবং যার হৃদয়ে নুন্যতম পরিমানও ঈমান আছে, সে তা লাভের চেষ্টায় ব্রতী হয়। আর সে সুসংবাদ ও অভীষ্ট হল, জান্নাত লাভ করা এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়া।

তিনি বলেছেন,

((كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الجَنَّةَ إلاَّ مَنْ أَبَى)).

"আমার উম্মতের প্রত্যেকেই জান্নাতে যাবে; কিন্তু সে নয় যে অস্বীকার করবে।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! (জান্নাতে যেতে আবার) কে অস্বীকার করবে?' তিনি বললেন,

((مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى)).

"যে আমার আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে যাবে এবং যে আমার অবাধ্যতা করবে, সেই জান্নাত যেতে অস্বীকার করবে।" *(বুখারী ৭২৮০নং)*

---

(৭৯) *ঐ ২৯৩ ও তার পরবর্তী পৃঃ*

আর দ্বীনে নতুন আমল উদ্ভাবন ও বিদআত করার মাধ্যমে নবী ﷺ-এর নির্দেশের বিরোধিতা করার চাইতে বড় আর কোন্ অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান হতে পারে? (৮০)

উবাই বিন কা'ব ﷺ বলেছেন, 'তোমরা (আল্লাহর) পথ ও সুন্নাহ অবলম্বন করো। যেহেতু কোন বান্দা পথ ও সুন্নাহর উপরে থেকে রহমানকে স্মরণ ক'রে তাঁর ভয়ে তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুবিগলিত হলে, তাকে কোন দিনই জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। পথ ও সুন্নাহতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা পথ ও সুন্নাহর পরিপন্থী অনেক আমল করার চাইতে উত্তম।'

যে ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাহর উক্তিসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, সে বুঝতে পারবে যে, দ্বীনে বিদআত রচনা করা হারাম এবং তা বিদআতীদের উপরে প্রত্যাবর্তিত। আর তাতে বিদআত ও বিদআতে কোন পার্থক্য নেই; যদিও বিদআতের প্রকার হিসাবে হারাম হওয়ার পর্যায়ে তফাৎ আছে। এই জন্য বিদআত থেকে নিষেধাজ্ঞা একই ভাবে এসেছে। নবী ﷺ বলেছেন,

(وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ).

"দ্বীনে নবরচিত কর্ম থেকে সাবধান থেকো। কারণ প্রত্যেক নবরচিত (দ্বীনী) কর্মই হল 'বিদআত'। আর প্রত্যেক বিদআতই হল ভ্রষ্টতা।" *(আহমাদ ১৭১৪৪, আবূ দাঊদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৮১৫ নং, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১৬৫নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)).

"যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কথা উদ্ভাবন করল---যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" *(বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ৪৫৮৯নং)*

বলা বাহুল্য, উক্ত হাদীস এ কথার দলীল যে, দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নব রচিত আমল বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। এর মানে হল, ইবাদত ও আকীদাতে সকল বিদআত হারাম (ও নিষিদ্ধ)। তবে বিদআতের প্রকার হিসাবে হারামের মানে পার্থক্য আছে। সুতরাং কিছু বিদআত

(৮০) *ঐ ২৯৬পৃঃ*

আছে, যা স্পষ্ট কুফরী। কিছু আছে শির্কের অসীলা। কিছু আছে, যা ফাসেকী ও অবাধ্যাচরণ (কাবীরা গোনাহ)।[৮১]

বক্রতা ও ভ্রষ্টতা অবলম্বী (বিদআতী)দের পথরাজি নিয়ে যে ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করবে, সে দেখতে পাবে যে, তাদের পথরাজি হিদায়াতীদের পথ থেকে ভিন্নতর।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ))

(آل عمران : ٧)

"তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন; যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; যার অন্যগুলি রূপক; যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিতনা (বিশৃংখলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে।" (আলে ইমরান ঃ ৭)

সহীহ হাদীসে এসেছে,

« إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ ».

"যখন তোমরা তাদেরকে দেখবে, যারা কুরআনের রূপক অংশের অনুসরণ করছে, তখন জেনো যে, আল্লাহ তাদের কথাই বলেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সাবধান থেকো।" (বুখারী ৪৫৪৭, মুসলিম ৬৯৪৬নং)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ)) (الأنعام : ١٥٩)

"অবশ্যই যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নেই।" (আন্‌আম ঃ ১৫৯)

তিনি আরো বলেছেন,

((وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ))

(الأنعام : ١٥٣)

---

(৮১) ঐ ২৯৮পৃঃ

"নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে।" (আন্‌আম ঃ ১৫৩)

বক্র পথাবলম্বীদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ

বক্র পথাবলম্বীদের প্রধান প্রধান লক্ষণ হল,[৮২]

১। নানা মতের সৃষ্টি।

যে ব্যাপারে মহান আল্লাহ এই বাণীতে সতর্ক করেছেন,

((إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ)) (الأنعام : ١٥٩)

"অবশ্যই যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নেই।" (আন্‌আম ঃ ১৫৯)

২। রূপক উক্তির অনুসরণ করা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

((فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ)) (آل عمران : ٧)

"যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিতনা (বিশৃংখলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে।" (আলে ইমরান ঃ ৭)

৩। মনের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করা।

যেমন পূর্বোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে। আর মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

((أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً)) (الفرقان : ٤٣)

"তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে।" (ফুরক্বান ঃ ৪৩)

৪। সুন্নাহকে কুরআনের সাংঘর্ষিক ধারণা করা।

---

(৮২) *এ বিষয়ে দ্রঃ শারহুস সুন্নাহ, বার্বাহারী ২২পৃঃ, আকীদাতুস সালাফ আসহাবিল হাদীস, স্বাবূনী ১৩২পৃঃ, শারহু উসূলিস সুন্নাহ, লালকাঈ ১/১৭৯, মাজমূউল ফাতাওয়া ৪/১৫৫, মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/২৩৯-২৪০, মাজমূউর রাসাইলি ওয়াল মাসাইলিন নাজদিয়্যাহ ৩/১২০, মাওক্বিফু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআতি মিন আহলিল আহওয়াই ওয়াল বিদা' ১/১২৭-১৩৪*

৫। আহলুল আষারকে ঘৃণা করা।

৬। আহলুস সুন্নাহর মন্দ খেতাব বের করা।

৭। সলফের মযহাব গ্রহণ না করা (বা প্রকাশ না করা)।[৮৩]

৮। বিনা দলীলে বিরোধী পক্ষকে কাফের বলা। (গালাগালি করা।)

৯। যে স্থলে বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন, সেখানে অবিশদ বলা। যার উপর কিয়াস শুদ্ধ নয়, তার উপর কিয়াস করা।

ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'ফিকহের ব্যাপারে যে কথা বলে, তার উচিত এই দুই নীতি থেকে নিজেকে দূরে রাখা ঃ মুজমাল (অবিশদ) ও কিয়াস।'

তিনি আরো বলেছেন, 'লোকেরা যে ব্যাপারে বেশি ভুল করে, সেটা হল ব্যাখ্যা ও কিয়াসে।'[৮৪]

আমি (লেখক) বলি, ফিকহের ক্ষেত্রে উক্ত দুই নীতির ব্যাপারে সতর্কবাণীরূপে ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) যে কথা উল্লেখ করেছেন, তা এই কথার দলীল যে, আকীদার ক্ষেত্রে উভয় থেকে দূরে থাকা আরো বেশি জরুরী।

---

(৮৩) *শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ মাজমূউল ফাতাওয়া (৪/১৫৬)তে বলেছেন, 'পক্ষান্তরে সলফের মযহাব গ্রহণ বিদআতীদের প্রতীক হবে, এ কথা অসত্য। কারণ এটা অসম্ভব। অবশ্য যে জায়গায় অজ্ঞতা বেশি ও ইল্‌মের কমতি আছে, সে জায়গার কথা আলাদা।*

আমি (লেখক) বলি, সাম্প্রতিককালে এমন ঘটনা ঘটেছে, নিজেকে সালাফী মানহাজের বলে ধারণা করে, অথচ সে তা নয়। বরং এমনও ব্যক্তি আছে, যে অধুনা রাজনৈতিক জামাআতগুলির ক্ষেত্রে 'সালাফিয়্যাহ' নাম প্রয়োগ করেছে। যাদের মধ্যে কিছু তো খাওয়ারিজের চিন্তাধারা পোষণ করে। সে ব্যক্তি মনে করে যে, উভয়ের মধ্যে 'সালাফিয়্যাহ' হল (অংকের পরিভাষায়) সাধারণ গুণনীয়ক। আর এ হল অধিক অজ্ঞতা ও ইল্‌ম স্বল্পতার পরিণতি; যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছেন। অথবা যে দাওয়াহ সালাফিয়্যাহ সলফে সালেহর বুঝ অনুযায়ী কিতাব ও সহীহ সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত, তাকে গুলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা, যাতে ভ্রষ্ট ফির্কাগুলিকেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের গন্ডিতে প্রবিষ্ট করা যায়।

(৮৪) *আল-ক্বাওয়াইদুন নূরানিয়্যাহ, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ২/৪৩৭*

৮। সালাফী মানহাজের কতিপয় নীতি

(ক) সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার ক্ষেত্রে নীতি

সৎকাজ বলতে উদ্দেশ্য হল, সকল প্রকার আনুগত্যের কাজ। আর তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল, শরীকবিহীন এক আল্লাহর ইবাদত করা, ইবাদতে তাঁর জন্য ইখলাস (বিশুদ্ধতা) রাখা এবং তিনি ছাড়া অন্যের ইবাদত বর্জন করা। এরপর আসে সকল আনুগত্য ওয়াজেব ও মুস্তাহাবসমূহ।

আর অসৎ (বা আপত্তিকর) কাজ বলতে উদ্দেশ্য হল, যে সকল কাজ আল্লাহ ও তাঁর রসূল নিষিদ্ধ গোষণা করেছেন। সুতরাং সকল প্রকার পাপাচরণ ও বিদআত হল অসৎ বা আপত্তিকর কাজ। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় অসৎ কাজ হল, মহান আল্লাহর সাথে শির্ক করা।[৮৫]

এই উম্মতের জন্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা ওয়াজেব কিফায়াহ, ব্যক্তিগতভাবে সকলের জন্য ওয়াজেব (আইন) নয়। যখন যথেষ্ট পরিমাণ লোক তা করবে, অবশিষ্ট লোকেরা গোনাহ থেকে বেঁচে যাবে। আর যখনই কেউই তা করবে না, তখন সকলেই গোনাহগার হবে।[৮৬]

((وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) (آل عمران : ١٠٤)

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে। আর এ সকল লোকই হবে সফলকাম।" (আলে ইমরান ঃ ১০৪)

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সৎ কার্যের আদেশ দেবে ও অসৎ কার্যে বাধাদান করবে, তার উচিত, যে বিষয়ে সে আদেশ দিচ্ছে,

---

(৮৫) *দ্রঃ আল-আমরু বিল মা'রূফি ওয়ান নাহয়্যু আনিল মুনকার, শায়খ আল্লামাহ সালেহ আল-ফাওযান ৬-৭পৃঃ*

(৮৬) *দ্রঃ আল-আমরু বিল মা'রূফি ওয়ান নাহয়্যু আনিল মুনকার, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ১৪ ও তার পরবর্তী পৃঃ*

সে বিষয়ের আলেম (ইল্ম-ওয়ালা) হবে, যে বিষয়ে নিষেধ করছে, তার ব্যাপারেও আলেম হবে।

যে বিষয়ে সে আদেশ দিচ্ছে, সে বিষয়ে সে বিনম্র হবে, যে বিষয়ে নিষেধ করছে, তাতেও সে বিনম্র হবে।

যে বিষয়ে সে আদেশ দিচ্ছে, সে বিষয়ে সে সহনশীল হবে, যে বিষয়ে নিষেধ করছে, তাতেও সে সহনশীল হবে।

সুতরাং আদেশ দেওয়ার কাজ করার আগে ইল্ম, আদেশ দেওয়ার কাজ করার সাথে নম্রতা এবং আদেশ দেওয়ার কাজ করার সাথে সহনশীলতা আবশ্যিক।

কিন্তু সে যদি আলেম না হয়, তাহলে যে বিষয়ে তার ইল্ম নেই, সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হওয়া তার জন্য বৈধ নয়।

পক্ষান্তরে যদি সে আলেম হয় এবং বিনম্র না হয়, তাহলে সে হবে এমন ডাক্তারের মতো, যার মধ্যে নম্রতা নেই। সুতরাং সে রোগীর সাথে কঠোর হবে, ফলে তা তার নিকট থেকে গ্রহণযোগ্য হবে না। অথবা সে নির্দয় শিক্ষকের মতো হবে, যার নিকট থেকে ছাত্র শিক্ষা নিতে চাইবে না।

আর মহান আল্লাহ মূসা ও হারূনের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

((فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى)) (طه : ٤٤)

"তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে।" (ত্বা-হা ঃ ৪৪)

অতঃপর যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়ার কাজ করবে, স্বাভাবিকভাবেই সে কষ্টের শিকার হবে। সুতরাং তার উচিত, ধৈর্য ধারণ করা ও সহনশীলতা অবলম্বন করা।

মহান আল্লাহ (লুকমান হাকীমের কথা) বলেছেন,

((يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)) (لقمان : ١٧)

"হে বৎস ! যথারীতি নামায পড়, সৎকাজের নির্দেশ দাও, অসৎকাজে বাধা দান কর এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এটিই দৃঢ় সংকল্পের কাজ।" (লুক্বমান ঃ ১৭)

শায়খুল ইসলাম আরো বলেছেন, 'ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধাদানকারীর উচিত, তার আদেশ ও নিষেধ যেন আল্লাহর জন্য এবং তাঁর আনুগত্য করার উদ্দেশ্যে হয়। তার যেন লক্ষ্য হয়, যাকে আদেশ-নিষেধ করা হচ্ছে, তার সংশোধন এবং তার বিরুদ্ধে হুজ্জত কায়েম। তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেন নিজের বা নিজ সম্প্রদায়ের সর্দারি করা এবং অপরকে ছোট করা না হয়।

আর দ্বীনের মৌলিক বিষয় হল, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা, আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণা করা, আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব করা, আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা করা, আল্লাহর ওয়াস্তে ইবাদত করা, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া, আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহর কাছে আশা করা, আল্লাহর ওয়াস্তে দান করা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে দান না করা। আর এটা হবে একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ ক'রে, যাঁর আদেশ হল আল্লাহ আদেশ, যাঁর নিষেধ হল আল্লাহর নিষেধ, যাঁর শত্রুতা হল আল্লাহর শত্রুতা, যাঁর আনুগত্য হল আল্লাহর আনুগত্য এবং যাঁর অবাধ্যাচরণ হল আল্লাহর অবাধ্যাচরণ। (সংক্ষেপে শায়খুল ইসলামের কথার সমাপ্তি)

(খ) ইবাদতের ক্ষেত্রে নীতি

ইবাদতের ভিত্তি হবে প্রমাণ-সাপেক্ষ। যেহেতু আল্লাহ রসূল ﷺ-এর অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছেন।[৮৭]

তিনি বলেছেন,

((قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ))

(آل عمران : ٣١)

"বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *(আলে ইমরান ঃ ৩১)*

তিনি আরো বলেছেন,

---

(৮৭) *রসূল ﷺ-এর অনুসরণ করার উদ্দেশ্য হল, তাঁর সেই সকল কাজে অনুসরণ, যা (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের জন্য ছিল, যা অভ্যাসগত ছিল (এবং ইবাদত ছিল না), তা নয়।*

((وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)) (النساء : ١٣)

"যে আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হয়ে চলবে, আল্লাহ তাকে বেহেশ্তে স্থান দান করবেন; যার নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ মহা সাফল্য।" (নিসা ঃ ১৩)

সহীহায়নে আছে, একদা উমার ﷺ হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন দেওয়ার সময় বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে চুমা দিচ্ছি। অথচ আমি জানি যে, তুমি কোন উপকার করতে পার না, অপকারও না। তবে যদি আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে চুম্বন দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না।' *(মুসলিম ৩১২৮, বুখারী ১৫৯৭, ১৬১০নং)*

আর এ কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, 'তোমরা (রসূল ﷺ ও সাহাবাগণের) অনুসরণ কর এবং বিদআত করো না। দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য তাঁরাই যথেষ্ট।'

এ কথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, আমল কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হল, (সেই আমলে) এককভাবে রসূল ﷺ-এর অনুসরণ করা।

কুরআন ও সুন্নাহতে প্রচুর উক্তি এসেছে, যাতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করার আদেশ পাওয়া যায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যাচরণ করার নিষেধ পাওয়া যায়। সুতরাং কারো জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে প্রমাণিত সুন্নাহ থেকে বের হয়ে যাবে, যার দলীল রয়েছে কিতাব ও সুন্নাহতে এবং যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন উম্মতের সলফগণ।

(গ) দ্বীনের কেন্দ্রবিন্দু হল উপকারী ইল্ম ও নেক আমল---এর নীতি

দ্বীনে ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু হল উপকারী ইল্ম ও নেক আমল। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছেন, 'উপকারিতা (বা কল্যাণ) নিহিত রয়েছে দুই প্রকার জিনিসের মধ্যে ঃ উপকারী ইল্ম ও নেক আমল। আর আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রেরণ করেছিলেন এর চাইতে উত্তম কিছু দিয়ে, তা হল হিদায়াত ও সত্য দ্বীন। যাতে তাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সুতরাং হিদায়াত হল, উপকারী ইল্ম এবং সত্য দ্বীন হল নেক আমল।'

তিনি আরো বলেছেন, 'বলা বাহুল্য, সলফে সালেহর অনুগামী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণে রসূল ﷺ-এর আনীত বিষয়ের অনুকরণ ছাড়া দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে কথা বলেন না। পক্ষান্তরে বিদআতীদের আচরণ হল, তারা কিতাব-সুন্নাহ ও সলফে সালেহর আষারের উপর নির্ভর করে না। বরং তারা বিবেক-বুদ্ধি, ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনশাস্ত্রের উপর নির্ভর করে।'[৮৮]

(ঘ) অকল্যাণ দূরীভূত করা কল্যাণ আনয়নের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত---এর নীতি

এই নীতির দলীল ঃ

১। মহান আল্লাহ বলেছেন,

((وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ)) (الأنعام : ١٠٨)

"তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে আহবান করে, তাদেরকে তোমরা গালি দেবে না। কেননা, তারা বৈরীভাবে অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহকেও গালি দেবে। *(আন্‌আম ঃ ১০৮)*

আল্লাহ মুশরিকদের উপাস্যদেরকে গালাগালি করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। অথচ সে গালি হয় রাগে, আল্লাহর জন্য পক্ষপাতিত্বে এবং তাদের উপাস্যদেরকে হেয় করতে। যেহেতু তা মহান আল্লাহকে গালি দেওয়ার অসীলা হয়ে যাবে। আর মহান আল্লাহকে গালি দেওয়া বর্জন করার মঙ্গলটা তাদের উপাস্যদেরকে গালি দেওয়ার মঙ্গল অপেক্ষা বেশি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

হাদীসে এসেছে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন,

((يَا عَائِشَةُ لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ)).

"আয়েশা! তোমার কওম যদি কুফরীর নিকটবর্তী যুগের (নও-মুসলিম) না হতো, তাহলে অবশ্যই আমি কা'বা ঘরকে ভেঙ্গে ইবরাহীম عليه السلام-এর ভিত্তি অনুসারে পুনর্নির্মাণ করতাম এবং তার জন্য দু'টি দরজা বানাতাম। একটি

---

(৮৮) *সংক্ষিপ্তাকারে শায়খুল ইসলামে উক্তি (মাজমূউল ফাতাওয়া থেকে উদ্ধৃত)।*

দরজা দিয়ে প্রবেশ করত ও অন্যটি দিয়ে বের হতো।" *(বুখারী ১২৬, মুসলিম ৩৩০৮নং, আহমাদ, নাসাঈ)*

এই হাদীস স্পষ্টভাবে উক্ত নীতির দলীল। যেহেতু নবী ﷺ ইব্রাহীম ﷺ-এর ভিত্তিতে কা'বাঘর নির্মাণের মঙ্গল বর্জন করলেন। যাতে সেই অমঙ্গল না ঘটে, যা তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। আর তা হল, যদি তিনি তা ভেঙ্গে ইব্রাহীমী ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণ করেন, তাহলে লোকেরা হয়তো তার ফলে ইসলামকে অপছন্দ করতে শুরু করবে অথবা ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে। তাই তিনি এই অমঙ্গল দূর করাকে ঐ মঙ্গল আনয়ন করার উপর প্রাধান্য দিলেন।

৩। নবী ﷺ মুনাফিকদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত ছিলেন। অথচ তাতে মঙ্গল ছিল। যেহেতু সেটা মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার মাধ্যম হয়ে যেত এবং লোকে বলত, মুহাম্মাদ নিজের সহচর হত্যা করেন।

৪। নবী ﷺ নেতা হত্যা করতে এবং রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেছেন; যদিও তারা যুল্‌ম করে, তাবৎ নামায কায়েম করে। যেহেতু মহা ফাসাদ ও অনেকানেক মন্দের অসীলা ও দ্বার বন্ধ হয়। বলা বাহুল্য, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বাস্তবতা স্পষ্ট। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করার মাধ্যমে তারা যে গর্হিত কাজে থাকে, তার চাইতে বহুগুণ বেশি গর্হিত কাজ সৃষ্টি হয়। আর উম্মত এ পর্যন্ত সেই অবশিষ্টাংশ বিপত্তির মাঝে অবস্থান করছে।

নবী ﷺ বলেছেন,

« إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا ».

"যখন দুটি খলীফার বায়াত গ্রহণ করা হবে, তখন তাদের দ্বিতীয়জনকে হত্যা করবে।" (মুসলিম ৪৯০৫নং)

কারণ, তাতে ফিতনার অসীলা বন্ধ করা যাবে।[৮৯]

'অকল্যাণ দূরীভূত করা কল্যাণ আনয়নের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত' এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ সাংঘর্ষিক হবে, তখন অগ্রাধিকারযোগ্যকে তার উপর প্রাধান্য দিতে হবে, যা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত নয়---এই নীতির অধীনে কতিপয় মাসায়েল উল্লেখ ক'রে শায়খুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'তার মধ্যে

(৮৯) *সংক্ষিপ্তাকারে শায়খুল ইসলামে উক্তি (মাজমূউল ফাতাওয়া থেকে উদ্ধৃত)।*

একটি হল, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্যতম নীতি, (এক রাষ্ট্রনেতার অধীনে) জামাআত অবলম্বন করা এবং (যালেম) রাষ্ট্রনেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বর্জন করা এবং ফিতনার সময় যুদ্ধ পরিহার করা। এর সামষ্টিক বিষয় সাধারণ নীতির মধ্যে প্রবিষ্ট। আর তা এই যে, যখন কল্যাণ ও অকল্যাণ এবং ভালো ও মন্দ সাংঘর্ষিক হবে অথবা একত্রিত হবে, তখন অগ্রাধিকারযোগ্যকে প্রাধান্য দিতে হবে। যখন কল্যাণ ও অকল্যাণ একত্রিত ও সাংঘর্ষিক হবে, তখন যদিও (ভালো কাজের) আদেশ ও (মন্দ কাজের) নিষেধ কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের অন্তর্ভুক্ত, তবুও তার বিপরীত দিকটা দেখতে হবে। সুতরাং যে কল্যাণ বর্জন হয় অথবা যে অকল্যাণ অর্জন হয়, তা যদি বেশি হয়, তাহলে তা করার আদেশ কার্যকর হবে না, বরং তা করা হারাম হবে, যখন কল্যাণের চাইতে অকল্যাণের পরিমাণ বেশি হবে।

পরন্তু কল্যাণ ও অকল্যাণের পরিমাণ নির্ধারণ হবে শরীয়তের নিক্তিতে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি বা দল ভালো ও মন্দ উভয়ই একত্রে এমনভাবে ক'রে থাকে যে, তারা উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করে না, বরং হয় তারা উভয়ই এক সাথে ক'রে থাকে অথবা এক সাথে ছেড়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে ভালো কাজের আদেশ দেওয়া যাবে না এবং মন্দ কাজে বাধাও দেওয়া যাবে না। বরং দেখতে হবে, যদি দেখা যায় ভালোর পরিমাণ বেশি, তাহলে তার আদেশ দেওয়া যাবে। যদিও তাতে তার চাইতে নিম্নমানের মন্দ কাজ ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এমন মন্দ কাজে নিষেধ করা যাবে না, যার ফলে তার চাইতে উচ্চমানের ভালো হাতছাড়া হয়ে যাবে। যেহেতু সে ক্ষেত্রে নিষেধ করাটা আল্লাহর পথে বাধা দেওয়া, তাঁর অনুগত্য ও তাঁর রসূলের আনুগত্য বিলোপ এবং সৎকার্যের বিলোপ সাধনের শামিল হয়ে দাঁড়াবে।

পক্ষান্তরে মন্দের পরিমাণ যদি বেশি হয়, তাহলে নিষেধ করতে হবে। যদিও তার ফলে তার চাইতে নিম্নমানের ভালো হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর সে ক্ষেত্রে ঐ ভালোর আদেশ দেওয়া, যে ভালো অধিকতর অতিরিক্ত মন্দ আনয়ন করে, তা হবে আপত্তিকর কাজ এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যাচরণের প্রচেষ্টা।

কিন্তু যদি ভালো ও মন্দ সমানাকার অবিচ্ছেদ্য হয়, তাহলে তাতে আদেশ দেওয়া যাবে না এবং নিষেধ করাও যাবে না। অতএব কখনো আদেশ উপযুক্ত

হবে কখনো নিষেধ, আবার কখনো আদেশ উপযুক্ত হবে না এবং নিষেধও না। যেহেতু সেখানে ভালো ও মন্দ অবিচ্ছেদ্য। আর এ হল নির্দিষ্ট ঘটনীয় ব্যাপারে।

অন্যথা শ্রেণীগত দিক থেকে সাধারণভাবে ভালোর আদেশ দিতে হবে এবং মন্দে বাধাদান করতে হবে। আর একজন কর্তার ক্ষেত্রে এবং একটি দলের ক্ষেত্রে তার ভালোর আদেশ দিতে হবে এবং তার মন্দে বাধা দিতে হবে। তার প্রশংসার্হের প্রশংসা ও নিন্দার্হের নিন্দা করতে হবে। আর তা এমনভাবে করতে হবে, যাতে ভালোর আদেশ অধিকতর ভালো ছুটে যাওয়া অথবা তার চাইতে উচ্চমানের কোন মন্দ সৃষ্টি হওয়ার কারণ না হয়। অনুরূপ মন্দের নিষেধ অধিকতর মন্দ সৃষ্টি হওয়া অথবা তার চাইতে অগ্রাধিকারযোগ্য কোন ভালো বেহাত হওয়ার কারণ না হয়।

এই শ্রেণীর কর্ম হল নবী ﷺ-এর আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল ও তার মতো দুষ্কৃতি ও মুনাফিকীর নেতৃবর্গকে মেনে নেওয়া। যেহেতু তাদের সাহায্যকারী ছিল। সুতরাং এক প্রকার শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে তার মন্দকে দূর করতে যাওয়ার মানে হতো, তার চাইতে অধিকতর ভালোর বিলুপ্তি। যা তার গোত্রকে ক্রোধান্বিত করত ও তাদের অন্ধ পক্ষপাতিত্বকে উত্তেজিত করত এবং লোকেরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যেত, যখন শুনত যে, মুহাম্মাদ তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে হত্যা করেন।'[৯০]

(ঙ) সকল উসূলী ও ফুরূয়ী (মুখ্য ও গৌণ) হুকুম-আহকাম দুটি বিষয় ছাড়া সম্পাদিত হয় না ঃ শর্ত পূরণ এবং বাধা অপসরণ---এর নীতি[৯১]

আমি (লেখক) বলি, শরীয়তের সকল আহকামে এটি একটি বিশাল নীতি। চাহে সে আহকাম মুখ্য বিষয়ক হোক অথবা গৌণ বিষয়ক, তাতে সকল শর্ত পূরণ হওয়া এবং সকল বাধা দূর হওয়া আবশ্যক। সুতরাং যদি কোন ক্ষেত্রে শর্ত পূরণ হয়, কিন্তু বাধা অবশিষ্ট থাকে, তাহলে বিধান কার্যকর হবে না।

উদাহরণ স্বরূপ যে (মু'মিন) হারাম কাজ করেছে, তার ব্যাপারে ধমকির আয়াতসমূহ। তাতে যে ধমকি এসেছে, তা প্রাপ্ত হওয়ার সে উপযুক্ত। কিন্তু যদি

---

(৯০) *মাজমূউল ফাতাওয়া ২৮/ ১২৮- ১৩১, আল-আম্র বিল মা'রূফি ওয়ান নাহয়্যু আনিল মুনকার, শায়খুল ইসলাম ২১পৃঃ*

(৯১) *শারহুল ক্বাওয়াইদিস সা'দিয়্যাহ ৮৯পৃঃ*

এমন কোন বাধা থাকে, যা তাকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিতে পারে। যেমন তওবা, তার জন্য মু'মিনদের ইস্তিগফার অথবা বালা-মসীবত[৯২] অথবা পাপমোচনকারী অন্যান্য কর্মাবলী।

উদাহরণ স্বরূপ স্বালাত, তাতে শর্ত পূরণ হওয়া জরুরী, আর তা হল পবিত্রতা। সুতরাং যে পবিত্রতা ছাড়া স্বালাত আদায় করবে, তার স্বালাত শুদ্ধ হবে না। যেহেতু তাতে শর্ত অবর্তমান।

এই নীতির অন্তর্ভুক্ত তাকফীর (কাউকে কাফের বলা), তাবদী' (বিদআতী বলা) ও তাফসীক (ফাসেক বলা)। (আর এটি হল এমন একটি ক্ষেত্র, যাতে ফিতনা ও বিপত্তি বিশালাকার ধারণ করেছে। কত স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। বহু বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে এবং খেয়ালখুশি ও মত-মন্তব্য বিক্ষিপ্তাকারে ছড়িয়ে পড়েছে।)[৯৩]

বলা বাহুল্য, বিদআতী ও ভুল আকীদার মানুষদের তাকফীর সম্বন্ধে সলফের মানহাজে চলমান আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অবস্থান হল তফসীল।[৯৪]

আর তা হল, বিদআতীরা সকলেই একই পর্যায়ের নয়। তাদের মধ্যে কিছু আছে, যাদেরকে নিশ্চিতরূপে কাফের বলা যাবে। যেমন যে ব্যক্তি কোন এমন কথা বলেছে বা এমন কাজ করেছে, যা মানুষকে কাফের বানিয়ে ফেলে। তাকফীরের শর্তাবলী পূরণ হয়েছে এবং তার সকল বাধা দূর হয়েছে। আবার

---

(৯২) *ঐ, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠায়*

(৯৩) *দ্রঃ মাওক্বিফু আহলিস সুন্নাতি মিন আহলিল বিদা' ১/২৩৭পৃঃ*

(৯৪) *এ বিষয়ে একটি মত আছে, তাতে কোন আহলে-ক্বিবলাকে তাকফীর করার কথা আমভাবে নাকচ করা হয়েছে। সুতরাং কোন আহলে-ক্বিবলাকে 'কাফের' বলা যাবে না। অন্য একটি মতে বিদআতীদেরকে আমভাবে তাকফীর করা যাবে। সুতরাং তারা সকলেই কাফের ইসলাম থেকে খারিজ। অথচ উভয় মতই সঠিকতা থেকে দূরে শরয়ী দলীলের পরিপন্থী। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) সেই ব্যক্তির ভ্রান্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি উক্ত দুটি মতকে একজন সালাফী ইমামের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। সঠিক হল তফসীল এবং এটাই হল হক, যা সলফদের ইমামগণ থেকে বর্ণিত। দ্রঃ মাজমূউল ফাতাওয়া ৭/৩৩৭-৩৪০*

তাদের মধ্যে এমনও বিদআতী আছে, যাকে কাফের বলে ফায়সালা দেওয়া যাবে না, যার মধ্যে উক্ত বিষয়গুলি বর্তমান নেই।[৯৫]

তারপর বিদআতীদেরকে তাকফীর করা এবং আমভাবে তাকফীর করার বিষয়টি দুটি বিশাল মূল জিনিসের উপর ন্যস্ত ঃ-

এক ঃ কিতাব ও সুন্নাহতে এ কথার দলীল থাকতে হবে যে, যাকে কাফের বলা হচ্ছে, তার দ্বারা বলা কথা বা কৃত কর্ম কাফের হওয়ার কারণ।

দুই ঃ এই বিধান নির্দিষ্ট বক্তা বা কর্তার উপর প্রয়োগ হবে, যখন তার মধ্যে তাকফীরের শর্তাবলী পাওয়া যাবে এবং কোন বাধা অবশিষ্ট থাকবে না।[৯৬]

এই দুটি মূল বিষয় প্রয়োগ করা হবে কোন ব্যক্তিকে বিদআতী বা ফাসেক বলার ক্ষেত্রেও। আর তা হল, কিতাব ও সুন্নাহতে এ কথার দলীল থাকতে হবে যে, যাকে বিদআতী বলা হচ্ছে, তার দ্বারা বলা কথা বা কৃত কর্ম বিদআত। এবং এই বিধান নির্দিষ্ট বক্তা বা কর্তার উপর প্রয়োগ হবে, যখন তার মধ্যে তাবদী'র শর্তাবলী পাওয়া যাবে এবং কোন বাধা অবশিষ্ট থাকবে না।[৯৭] আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

---

(৯৫) *দ্রঃ মাজমূউল ফাতাওয়া ৩/৩৫২-৩৫৪, ১২/৪৯৭-৪৯৮, শারহুল আকীদাতিত ত্বাহাবিয়্যাহ ৩৩৮-৩৪০, এ বিষয়ে পূর্ণরূপে জানতে আরো দেখুন, মূল্যবান পুস্তক 'মাউক্বিফু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআতি মিন আহলিল বিদা', সম্মানিত ভাই ডঃ ইব্রাহীম রুহাইলী ১/ ১৬৩-২৩৫*

(৯৬) ঐ

(৯৭) ঐ

৯। বিদআতীদের ব্যাপারে সলফের ভূমিকা

খেয়ালখুশির পূজারী, বিদআতী ও সুন্নাহ-বিরোধীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন ও সতর্কীকরণ।

নবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)).

"যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কথা উদ্ভাবন করল---যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" *(বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ৪৫৮৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيهِ أمرُنا فَهُوَ رَدٌّ)).

"যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই তা বর্জনীয়।" *(মুসলিম ৪৫৯০নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ ».

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে (কাউকে) ভালোবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে (কাউকে) ঘৃণাবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে (কিছু) প্রদান করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই (কিছু প্রদান করা হতে) বিরত থাকে সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমান লাভ করেছে।" *(আবু দাউদ ৪৬৮৩নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ)).

"আমার পূর্বে আল্লাহ যে কোন নবীকে যে কোন উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে তাঁর (কিছু) সহযোগী ও সঙ্গী হতো। তারা তাঁর সুন্নতের উপর আমল করত এবং তাঁর আদেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পরে

এমন অপদার্থ লোক সৃষ্টি হয় যে, তারা যা বলে, তা করে না এবং তারা তা করে, যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু'মিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিভ দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু'মিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সে মু'মিন। আর এর পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই।" *(মুসলিম ১৮৮নং)*

(يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

"অচিরেই শেষ যামানায় একটি নির্বোধ যুব-দল হবে, যারা লোক সমাজে সৃষ্টির সবার চাইতে উত্তম কথা বলবে। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ ক'রে বের হয়ে যায়। ঈমান তাদের গলদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। সুতরাং তোমরা এদেরকে যেখানেই পাবে, সেখানেই হত্যা করে ফেলবে। যারা তাদেরকে হত্যা করবে, তারা কিয়ামতে পুরস্কৃত হবে।" (বুখারী ৫০৫৭, মুসলিম ২৫১১নং)

উক্ত হাদীসে উদ্দিষ্ট হল খাওয়ারিজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ আলী বিন আবী তালেব ﷺ-এর সাথে থেকে তাদের বিরুদ্ধে নাহরাওয়ানে যুদ্ধ করেছেন।

বলা বাহুল্য, প্রাগুক্ত (হাদীসের) উক্তিসমূহ ও তার অর্থে অন্যান্য বাণীর কারণেই সলফের ইমামগণ বিদআত ও বিদআতী থেকে সাবধান করেছেন। তাঁদের গ্রন্থসমূহ ও রচনাবলী বিদআত ও বিদআতীদের খন্ডনে এবং এ ব্যাপারে সতর্কীকরণে পরিপূর্ণ।

তার মধ্যে কিছু উক্তি নিম্নরূপ ঃ-

১। (ইমাম) মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে ইয়াহয়্যা বিন ইয়া'মুর ও হুমাইদ বিন আব্দির রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহয়্যা আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ-কে বললেন, 'আমাদের দিকে কিছু লোক বের হয়েছে, যারা কুরআন (বেশী বেশী) পাঠ করে এবং ইল্‌ম অনুসন্ধান ক'রে বেড়ায়।' অতঃপর তাদের আরো অন্যান্য অবস্থা বর্ণনা ক'রে বললেন, 'তারা ধারণা করে যে, তকদীর বলে কিছু নেই এবং সমস্ত বিষয় সদ্য উদ্ভূত, (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পূর্বে কিছুরই তকদীর (ভাগ্য) নির্ধারিত করেননি এবং কিছু ঘটার পূর্বে তিনি তার অবস্থা

সম্পর্কে অবহিত নন।) এ কথা শুনে ইবনে উমার ﷺ তাঁকে বললেন, 'ওদের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হলে ওদেরকে খবর দাও যে, ওদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং আমার সাথে ওদের কোন সম্পর্ক নেই। আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ যাঁর হলফ করেন, তাঁর শপথ! যদি ওদের কারো উহুদ (পর্বত) সমপরিমাণ সোনা থাকে এবং তা দান করে, তাহলে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তা কবুল করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তকদীরের উপর ঈমান এনেছে।' *(মুসলিম ১০২নং)*

২। উমার বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'তোমরা রায়-ওয়ালা থেকে দূরে থেকো। কারণ তারা সুন্নাহর দুশমন। হাদীস মুখস্থ করতে অপারগ হয়ে নিজেদের রায় (জ্ঞান) দ্বারা কথা বলে (দ্বীনী বিধান দেয়) ফলে তারা নিজেরা ভ্রষ্ট হয় এবং অপরকেও ভ্রষ্ট করে।' *(লালকাঈ ১/১২৩, আল-ফক্বীহ অল-মুতাফাক্কিহ, বাগদাদী ১/১৮০, আল-জামে' ইবনে আব্দুল বার্র ৪৭৬পৃঃ)*

৩। দারেমী ও লালকাঈ প্রমুখ আবূ ক্বিলাবাহ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি বা জাতি বিদআত রচনা করলেই তরবারি হালাল করে নেয়।' *(দারেমী ৯৯, লালকাঈ ২৪৭নং)*

৪। আবূ আইয়ুব সাখতিয়ানী বলেছেন, 'খেয়ালখুশির পূজারীরা সবাই খাওয়ারিজ।' তিনি আরো বলেছেন, 'খাওয়ারিজরা নামে ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু তরবারি (বিদ্রোহ)তে এক।' *(আল-ই'তিসাম ১/১১৩)*

৫। সুফিয়ান সওরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'ইবলীসের নিকট পাপ অপেক্ষা বিদআত বেশি প্রিয়। কারণ, পাপ থেকে তওবা (কবুল) করা হয়, বিদআত থেকে তওবা (কবুল) করা হয় না।' *(লালকাঈ ২৩৮নং)*[৯৮]

---

(৯৮) *সুফিয়ান (রাহিমাহুল্লাহ) বিদআতীর তওবা কবুল না হওয়ার যে কথা বলেছেন, সেটা অধিকাংশ বিদআতীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেহেতু সে যা করার করে এবং সেটাকে দ্বীন মনে ক'রে তার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য কামনা করে। আর এ কথার সমর্থন করে নবী ﷺ-এর এই বাণী,*

((إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)).

"আল্লাহ প্রত্যেক বিদআতীর তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত রাখেন (গ্রহণ করেন না), যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বিদআত বর্জন না করেছে।" (ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৪২০২, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৯৪৫৭, সহীহ তারগীব ৫৪নং)

৬। অনুরূপ ক্বাতাদাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'হে আহওয়াল! ব্যক্তি যখন বিদআত রচনা করে, তখন তা (মানুষের কাছে) উল্লেখ করা উচিত। যাতে সাবধান হওয়া বা করা যায়।' (লালকাঈ ২৫৬নং)

৭। হাসান (বাসরী) বলেছেন, 'খেয়ালখুশির পূজারী (বিদআতীরা) ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের মর্যাদায়।' (ঐ ২৩৩নং)[৯৯]

৮। উমার বিন আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যখন কোন সম্প্রদায়কে দেখবে যে, তারা জনসাধারণকে বাদ দিয়ে কোন গুপ্ত বিষয়ে মন্ত্রণা ও পরামর্শে লিপ্ত হচ্ছে, তখন (জেনে নিয়ো) তারা ভ্রষ্টতার ভিত্তিস্থাপনে রত আছে।' *(দারেমী ১/১০৩, ৩০৭নং)*

৯। আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেন, 'আমি ইসলামের কোন কিছু নিয়ে এত খুশি হইনি, যত বেশি খুশি হয়েছি এই নিয়ে যে, আমার অন্তরে এই শ্রেণীর কোন খেয়ালখুশি প্রবেশ করেনি।' (লালকাঈ ২২৭নং)

১০। এক সম্প্রদায় আসবে, যারা এই (আঙ্গুলের ডগা) বরাবর সুন্নাহ বর্জন করবে। অতঃপর তোমরা যদি তাদেরকে উপেক্ষা করো, তাহলে তারা মহাসংকট সৃষ্টি করবে।' (ঐ ১২২নং)

সলফের ইমামগণ কেবল বিদআতী ভ্রষ্টদের খন্ডন করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তাঁরা তাদের সাথে ওঠা-বসা করতে এবং তাদের কথা শুনতেও সাবধান করেছেন।

সুতরাং দারেমী ও ইবনে বাত্ত্বাহ হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, 'তোমরা প্রবৃত্তিপূজারীদের সাথে ওঠা-বসা করো না, তাদের সাথে বিতর্ক করো না এবং তাদের কাছে কিছু শোনোও না।' (ঐ ২৪০নং)

আ-জুর্রী ও লালকাঈ হাসান কর্তৃক আরো বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, 'হে আবু সাঈদ! আমি আপনার সঙ্গে বিতর্ক করতে চাই।' হাসান বললেন, 'দূর হও আমার নিকট থেকে। আমি আমার দ্বীন জেনেছি। তোমার সাথে সেই বিতর্ক করবে, যে তার দ্বীনে সন্দিহান।' (লালকাঈ ২১৫নং)

---

(৯৯) *তাঁর উদ্দেশ্য, তারা নিজেদের মত অবলম্বনে ও সুন্নাহ বর্জনের দিক থেকে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের মর্যাদায়, এ নয় যে, তারা কাফের।*

ইসমাঈল বিন খারেজাহ বলেন, ইবনে সীরীনের নিকট দুই প্রবৃত্তিপূজারী (বিদআতী) ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল। তারা তাঁকে বলল, 'হে আবূ বাক্র! আমরা আপনার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করব?' তিনি বললেন, 'না।' তারা বলল, 'তাহলে আল্লাহর কিতাব থেকে একটি আয়াত পড়ে শুনাই?' তিনি বললেন, 'না। তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও, নচেৎ আমিই এখান থেকে উঠে যাব।' অবশেষে তারা দু'জনে সেখান হতে বের হয়ে গেল। উপস্থিত লোকেদের মধ্যে কেউ বলল, 'হে আবূ বাক্র! ওরা আপনার কাছে আল্লাহ তাআলার কিতাব থেকে একটি আয়াত পাঠ ক'রে শুনালে আপনার কী ক্ষতি ছিল?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি ভয় করলাম যে, ওরা হয়তো বা কোন আয়াত হেরফের (বিকৃত) ক'রে পড়বে, আর তা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে যাবে।' *(দারেমী ১/১২০, ৩৯৭নং)*

আব্দুল্লাহ বিন ইমাম আহমাদ 'সুন্নাহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আবূ ক্বিলাবাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'বিদআতীদের সংসর্গে ওঠা-বসা করো না এবং তাদের সাথে তর্ক-বাহাস করো না। কারণ, আমার ভয় হয় যে, তারা তোমাদেরকে নিজেদের ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ক'রে ফেলবে। অথবা হক-বাতিলের এমন সংমিশ্রণ ঘটিয়ে দেবে যে, তোমরা টেরও পাবে না।' *(ইবনে ওয়াযযাহ ৫৫পৃঃ, আল-ই'তিসাম ১/১৭২, আল-লালকাঈ ১/১৩৪, ২৪৪নং, দারেমী ১/১২০, ৩৯১নং, আল-ইবানাহ ২/৪৩৭, ৩৬৯নং, আশ-শারীআহ ৬১পৃঃ)*

এ ছিল কিছু নববী পবিত্র বাণী ও দ্বীনদার পরহেযগার যাহেদ ও সংযমী সলফদের ইমামগণের উক্তি, সেই সাথে যুক্ত করে নিন পূর্বোক্ত সেই সকল বাণী, যা অনুসরণ করতে আদেশ দেয় এবং বিদআত রচনা করতে নিষেধ করে, এ সব কিছুই স্পষ্ট করে যে, বিদআতীদের নিন্দা করা ও তাদের অবস্থা লোক-সমাজে বয়ান করা বৈধ। বরং তাঁরা এ কাজকে এমন ওয়াজেবসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন, যা পালন করা ছাড়া দ্বীন কায়েম হবে না। আর এ হল আল্লাহর পথে জিহাদের পর্যায়ভুক্ত, যা মর্যাদা ও উদ্দেশ্যের মহত্ত্বে শত্রুর বিরুদ্ধে তরবারি ও অস্ত্র দ্বারা জিহাদের সমতুল্য।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'কিতাব ও সুন্নাহ-বিরোধী বক্তা অথবা কিতাব ও সুন্নাহ-বিরোধী ইবাদতকারী বিদআতের ইমামগণের মতো লোকেদের অবস্থা বয়ান করা এবং উম্মতকে তাদের থেকে সাবধান করা মুসলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজেব। এমনকি আহমাদ বিন

হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হল, যে ব্যক্তি (নফল) রোযা রাখে, নামায পড়ে ও ই'তিকাফ করে, সে আপনার নিকট বেশি পছন্দনীয়, নাকি সেই ব্যক্তি, যে বিদআতীদের খন্ডন করে?

উত্তরে তিনি বললেন, 'সে যদি (রাতে) কিয়াম করে, নামায পড়ে ও ই'তিকাফ করে, তাহলে তা হবে নিজের জন্য। আর যদি সে বিদআতীদের খন্ডন করে, তাহলে তা হবে মুসলিমদের জন্য। এটা বেশি ভালো।'

সুতরাং তিনি স্পষ্ট করলেন যে, এর উপকারিতা মুসলিমদের দ্বীনের ক্ষেত্রে ব্যাপক, আল্লাহর পথে জিহাদের শ্রেণীভুক্ত। যেহেতু আল্লাহর পথ, তাঁর দ্বীন, পন্থা ও শরীয়তকে নির্মল করা এবং তার উপর ওদের বিদ্রোহ ও শত্রুতাকে প্রতিহত করা মুসলিমদের ঐক্যমতে ওয়াজেব-এ-কিফায়াহ। আল্লাহ যদি ওদের অনিষ্টকারিতা দূর করার জন্য এমন মানুষ খাড়া না করেন, তাহলে দ্বীন ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যুদ্ধজয়ী শত্রুর আধিপত্যের ফলে হওয়া ধ্বংস থেকে দ্বীন ধ্বংস আরো গুরুতর। যেহেতু শত্রুদল আধিপত্য লাভ করলে কিছুকাল পরে ছাড়া মানুষের হৃদয় ও তন্মধ্যস্থিত (ঈমান) ধ্বংস করতে পারে না। আর ওরা শুরু থেকেই হৃদয়কে ধ্বংস করে।'[১০০]

তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'যদি বিদআতী কিতাব ও সুন্নাহ-বিরোধী আকীদার দিকে মানুষকে আহবান করে এবং এই আশঙ্কা হয় যে, সে লোকেদেরকে এর মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করবে, তাহলে লোকেদের জন্য তার হাল-হকীকত খুলে বলতে হবে। যাতে লোকেরা তার ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচতে পারে এবং তার অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে। তবে এ সব ক্ষেত্রে ওয়াজেব এই যে, তা হবে হিতাকাঙ্ক্ষী অন্তরে (উপদেশ ছলে) এবং মহান আল্লাহর তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে। তার সাথে মানুষের প্রবৃত্তির প্ররোচনার বশবর্তী হয়ে করলে চলবে না। যেমন উভয়ের মধ্যে পার্থিব কোন বিষয়ে শত্রুতা আছে, অথবা হিংসা বা বিদ্বেষ আছে, অথবা পদ (বা গদি) নিয়ে রেষারিষি আছে, তাই সে বাহ্যতঃ উপদেশ ছলে তার দোষ প্রকাশ ক'রে কথা বলছে, অথচ অভ্যন্তরে তার উদ্দেশ্য হল তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেওয়া। আর এ হল শয়তানের কাজ।'[১০১]

([১০০]) *মাজমূউল ফাতাওয়া ২৮/২৩১-২৩২*

([১০১]) *ঐ ২৮/২২১*

বলা বাহুল্য, সাহাবা, তাবেঈন ও তাঁদের মানহাজের অনুগামী সলফে সালেহগণ কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ ক'রে বিদআত ও বিদআতীর নিন্দা করা এবং বিদআত ও বিদআতীর ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করার বিষয়ে একমত।[১০২]

সুতরাং এ বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ করা (আমাদের জন্য) ওয়াজেব।

১০। সলফদের অন্যতম মানহাজ ঃ বিরোধীর খন্ডন[১০৩]

সলফের ইমামগণ (রাহিমাহুমুল্লাহ) এর নিকট অন্যতম স্বতঃসিদ্ধ নীতি হল বিরোধীর খন্ডন। চাহে সে বিরোধী আহলে সুন্নাহ ওয়া জামাআতের কেউ হোক, যে কোন ফিকহ বা আকীদার মাসআলায় ভিন্নমত পোষণ করেছে অথবা সে বিরোধী বিদআতী হোক।[১০৪]

আর এটা অনাবশ্যক যে, বিরোধীর খন্ডনের সময় তার গুণাবলী উল্লেখ করতে হবে অথবা তার সদ্‌গুণ ও বদ্‌গুণ তুলনামূলক বিচার করতে হবে। যেহেতু আল্লাহ মু'মিনদের নিন্দনীয় কর্মাবলীর উল্লেখ ছাড়াই তাদের প্রশংসা

---

(১০২) *দ্রঃ আল-ই'তিস্বাম, শাত্বেবী ১/১৪১-১৪২, আর শায়খুল ইসলামের উল্লিখিত উক্তি লক্ষ্য করুন, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বিদআতীদের বিদ্রোহ ও তাদের শত্রুতার প্রতিরক্ষা করা মুসলিমদের ঐক্যমতে ওয়াজেব-এ-কিফায়াহ।*

(১০৩) *আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট এটি অন্যতম স্বতঃসিদ্ধ নীতি। এটাকে তাঁর উপদেশের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেন। কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমাতে এই নীতির সপক্ষে দলীল বিদ্যমান। আর সে নীতি হল, বিরোধীর খন্ডন। এই নীতি---বিরোধীর খন্ডন---এর বিষয়ে অধিক বিস্তারিত জানার জন্য শায়খ আল্লামাহ ডঃ রাবী' বিন হাদী মাদখালী (হাফিযাহুল্লাহ)র 'মানহাজু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআতি ফী নাক্বদির রিজালি ওয়াল কুতুবি ওয়াত ত্বাওয়াইফ' নামক মূল্যবান পুস্তক এবং ডঃ বাক্‌র আবূ যায়দের মূল্যবান পুস্তক 'আর-রাদ্দু আলাল মুখালিফি মিন উসূলিল ইসলাম' দ্রষ্টব্য।*

(১০৪) *কিন্তু আহলে সুন্নাহ ওয়া জামাআতের খন্ডনযোগ্য ব্যক্তির ভুলগুলি যদি এমন বিষয়ে হয়, যাতে আকীদার কোন ক্ষতি না হয়, তাহলে তার গুণাবলী উল্লেখ করা যাবে এবং তার সুকর্মাবলী সুন্নাহর সাহায্যে তার ভ্রান্তিগুলিকে গোপন ক'রে নেবে। পক্ষান্তরে যদি খন্ডনযোগ্য ব্যক্তি কোন ভ্রান্ত দলের হয়, তাহলে তার সুকর্মাবলী উল্লেখ করা আমাদের জন্য বৈধ হবে না। (শায়খ আল্লামাহ ডঃ সালেহ আল-ফাওযান 'হাফিযাহুল্লাহ'র বক্তব্য থেকে)*

করেছেন এবং কাফের, মুনাফিক ও ফাসেকদের প্রশংসনীয় কর্মাবলীর উল্লেখ ছাড়াই তাদের নিন্দা করছেন। আর নবী ﷺ প্রবৃত্তিপূজারীদের ব্যাপারে তাদের গুণাবলী দৃষ্টিচ্যুত করেই নিজ উম্মতকে সতর্ক করেছেন। নবী ﷺ কিছু নির্দিষ্ট মানুষের দোষসমূহ বর্ণনা করেছেন এবং উপদেশ হিসাবে তাদের গুণাবলী উল্লেখ করেননি।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন,

[هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ] {آل عمران:٧}

"তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন; যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; যার অন্যগুলি রূপক; যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিতনা (বিশৃংখলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, 'আমরা এ বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত।' বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।" (আলে ইমরান ঃ ৭)

(আয়েশা বলেন,) অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

« إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ ».

"যখন তোমরা তাদেরকে দেখবে, যারা কুরআনের রূপক অংশের অনুসরণ করছে, তখন জেনো যে, আল্লাহ তাদের কথাই বলেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সাবধান থেকো।" (বুখারী ৪৫৪৭, মুসলিম ৬৯৪৬নং)

আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

«سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ».

"শেষ যুগে আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতক লোক হবে, যারা তোমাদেরকে সেই হাদীস বর্ণনা করবে, যা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরাও শ্রবণ করেনি। সুতরাং তোমরা তাদের হতে সাবধান থেকো।" *(মুসলিম ১৫নং)*

আর এ কথা বিদিত যে, বিদআতীরা সদ্‌গুণশূন্য নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেননি, তিনি তা উল্লেখ করেননি এবং বলেননি যে, তোমরা তাদের সদ্‌গুণ দ্বারা উপকৃত হয়ো।[১০৫]

উক্ত হাদীস-দুটির ব্যাখ্যায় বাগাবী বলেছেন, 'নবী ﷺ অবহিত করেছেন যে, এ উম্মত দলেদলে বিভক্ত হবে, প্রবৃত্তিপূজারী ও বিদআতী দলের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। আর সেই ব্যক্তির পরিত্রাণ পাওয়ার কথা নিশ্চিত করেছেন, যে তাঁর সুন্নাহ ও তাঁর সাহাবার সুন্নাহর অনুসরণ করবে। সুতরাং মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হল, সে যখন কোন ব্যক্তিকে প্রবৃত্তিপূজা বা বিদআতের কিছুতে মনের বিশ্বাসে লিপ্ত হতে দেখবে অথবা দেখবে, সে কোন সুন্নাহর ব্যাপারে শৈথিল্য করছে, তাহলে তাকে ত্যাগ করবে, তার সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করবে এবং জীবনে ও মরণে তাকে বর্জন করবে। তাকে সালাম দেবে না, সে আগে সালাম দিলে তার উত্তর দেবে না; যতক্ষণ না সে তার বিদআত পরিহার করেছে এবং হকের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে।

পক্ষান্তরে সাহচর্য গ্রহণ বা আপোসে বসবাসকালে কোন ত্রুটি ঘটার ফলে দুই ব্যক্তির মাঝে যে ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকে, তা তিন দিনের বেশি নিষেধ হওয়ার ব্যাপারটা দ্বীনের কোন হক বিষয়ে ছাড়াছাড়ি অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের। যেহেতু প্রবৃত্তিপূজক ও বিদআতীর সাথে ছাড়াছাড়ির বিষয়টি চিরতরের; যদি সে তওবা না করে।'[১০৬]

এ গেল প্রবৃত্তিপূজারী ও বিদআতীদের থেকে সাবধান করার ব্যাপার। বাকী থাকল নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের সুকৃতি উল্লেখ না ক'রে নবী ﷺ যে তাদের দোষ উল্লেখ করেছেন, তার ব্যাপার। তো এর প্রমাণ হল নিম্নরূপ ঃ-

---

(১০৫) *মানহাজু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআতি ফী নাক্বদির রিজালি ওয়াল কুতুবি ওয়াত্ ত্বাওয়াইফ, শায়খ আল্লামাহ ডঃ রাবী' বিন হাদী মাদখালী ১৮পৃঃ*

(১০৬) *প্রাগুক্ত, শারহুস সুন্নাহ ১/২৭৭*

১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একটি লোক নবী ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি চাইল। তিনি বললেন,

((ائْذَنُوا لَهُ ، بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ !))

"ওকে অনুমতি দাও। ও নিজ বংশের অত্যন্ত মন্দ ব্যক্তি।" *(বুখারী ৬০৫৪, মুসলিম ৬৭৬১-৬৭৬২নং)*

কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'উক্ত হাদীসে এমন ব্যক্তির গীবত করার বৈধতা প্রমাণিত হয়, যে প্রকাশ্যে পাপাচারিতা অথবা অশ্লীলতা বা অনুরূপ কিছুর সাথে যুক্ত; যেমন বিচারে অন্যায় এবং বিদআতের দিকে আহবান করা ইত্যাদি।'(১০৭)

নাওয়াবী বলেছেন, 'হাদীসে রয়েছে যার অশ্লীলতার আশঙ্কা হয়, তার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করার কথা। আর সেই ফাসেকের গীবত করার বৈধতা, যে প্রকাশ্যে পাপাচার করে এবং এমন লোকের গীবত, যার ব্যাপারে লোককে সাবধান করা প্রয়োজন।'(১০৮)

২। ফাত্বেমাহ বিন্তে ক্বাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, 'আবুল জাহম ও মুয়াবিয়াহ আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন। (এ ক্ষেত্রে আমি কী করব?)' রসূল ﷺ বললেন,

((أَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو الجَهْمِ ، فَلاَ يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ، انْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ)).

"মুআবিয়াহ তো নিঃস্ব মানুষ, তার নিকট মালধনই নেই। আর আবুল জাহম, সে তো নিজ কাঁধ হতে লাঠিই নামায় না। তুমি উসামাহ বিন যায়দকে বিবাহ করো।" *(মুসলিম ৩৭৭০নং)*

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উভয় ব্যক্তির মাহাত্ম্য ও সদ্‌গুণাবলী ছিল। কিন্তু ক্ষেত্রটি ছিল উপদেশ ও পরামর্শের; সেখানে এর চাইতে বেশি কথা অপ্রয়োজনীয়।

---

(১০৭) *ফাতহুল বারী ১০/৪৫২*

(১০৮) *সহীহ মুসলিমের শারহুন নাওয়াবী ১৬/১৪৪*

৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একদা আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ্ বিন্তে উতবাহ নবী ﷺ-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমি তার সম্পদ থেকে (তার অজান্তে) যা কিছু নিই তা ছাড়া সে আমার ও আমার সন্তানকে যথেষ্ট পরিমাণে খরচ দেয় না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

((خُذِيْ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ)).

"তোমার ও তোমার সন্তানের প্রয়োজন মোতাবেক খরচ (তার অজান্তে) নিতে পার।" (বুখারী ৫৩৬৪, মুসলিম ৪৫৭৪নং)

হাফেয বিন হাজার বলেছেন, 'এই হাদীস এ কথার দলীল যে, মানুষের অপছন্দনীয় কিছু (তার পশ্চাতে) উল্লেখ করা বৈধ, যদি তা ফতোয়া জানার জন্য, অভিযোগ করার জন্য এবং অনুরূপ কিছুর জন্য হয়। আর এ হল সেই ক্ষেত্রসমূহের অন্যতম, যেখানে গীবত করা বৈধ।' (ফাতহুল বারী ৯/৫০৯)

বলা বাহুল্য, নবী ﷺ হিন্দের (স্বামীর) মন্দ দিক উল্লেখ করাতে কোন প্রতিবাদ করলেন না এবং তাকে এ আদেশও দিলেন না যে, তুমি আবূ সুফিয়ানের ভালো গুণগুলি এবং সে যে গুণধর সে কথাও উল্লেখ করো।[১০৯]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'ন্যায়ভাবে হাদীসের বর্ণনাকারীদের দোষ বর্ণনা করা ও বিদআতীদের বিদআত উল্লেখ করা ওয়াজেব।' তিনি আরো বলেছেন,

'কিতাব ও সুন্নাহ-বিরোধী বক্তা অথবা কিতাব ও সুন্নাহ-বিরোধী ইবাদতকারী বিদআতের ইমামগণের মতো লোকেদের অবস্থা বয়ান করা এবং উম্মতকে তাদের থেকে সাবধান করা মুসলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজেব। এমনকি আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হল, যে ব্যক্তি (নফল) রোযা রাখে, নামায পড়ে ও ই'তিকাফ করে, সে আপনার নিকট বেশি পছন্দনীয়, নাকি সেই ব্যক্তি, যে বিদআতীদের খন্ডন করে?

উত্তরে তিনি বললেন, 'সে যদি (রাতে) কিয়াম করে, নামায পড়ে ও ই'তিকাফ করে, তাহলে তা হবে নিজের জন্য। আর যদি সে বিদআতীদের খন্ডন করে, তাহলে তা হবে মুসলিমদের জন্য। এটা বেশি ভালো।'

---

(১০৯) *মানহাজু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআতি ফী নাক্বদির রিজালি ওয়াল কুতুবি ওয়াত ত্বাওয়াইফ ২০-২১পৃঃ*

সুতরাং তিনি স্পষ্ট করলেন যে, এর উপকারিতা মুসলিমদের দ্বীনের ক্ষেত্রে ব্যাপক, আল্লাহর পথে জিহাদের শ্রেণীভুক্ত। যেহেতু আল্লাহর পথ, তাঁর দ্বীন, পন্থা ও শরীয়তকে নির্মল করা এবং তার উপর ওদের বিদ্রোহ ও শত্রুতাকে প্রতিহত করা মুসলিমদের ঐক্যমতে ওয়াজেব-এ-কিফায়াহ। আল্লাহ যদি ওদের অনিষ্টকারিতা দূর করার জন্য এমন মানুষ খাড়া না করেন, তাহলে দ্বীন ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যুদ্ধজয়ী শত্রুর আধিপত্যের ফলে হওয়া ধ্বংস থেকে দ্বীন ধ্বংস আরো গুরুতর। যেহেতু শত্রুদল আধিপত্য লাভ করলে কিছুকাল পরে ছাড়া মানুষের হৃদয় ও তন্মধ্যস্থিত (ঈমান) ধ্বংস করতে পারে না। আর ওরা শুরু থেকেই হৃদয়কে ধ্বংস করে।'[১১০]

১১। ব্যক্তি ও জামাআতের জন্য পালনীয় কতিপয় নিয়ম-নীতি

এই নিয়ম-নীতিই[১১১] নির্ধারণ করে, কোন্ মানুষকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা ওয়াজেব, বিধায় তাকে অসম্মান করা বৈধ নয়। এবং নির্ধারণ করে সুকৃতির প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে কোন্ মানুষের সমালোচনা ও খন্ডন করা বৈধ; বরং প্রয়োজনে ও বৃহত্তর স্বার্থে তা করা ওয়াজেব।

প্রথমতঃ যাঁদের সম্মান করা ওয়াজেব

(ক) নবী ও রসূলগণ (স্বালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহু আলাইহিম আজমাঈন)

(খ) সাহাবায়ে কিরাম (রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন)

সুতরাং উম্মাহর পক্ষ থেকে তাঁদের জন্য রয়েছে কেবল ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

---

(১১০) *মাজমূউল ফাতাওয়া ২৮/২৩১-২৩২*

(১১১) *এই নিয়ম-নীতিমালা শায়খ রাবী' আল-মাদখালী তাঁর পুস্তক মানহাজু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআতি ফী নাক্বদির রিজালি ওয়াল কুতুবি ওয়াত ত্বাওয়াইফ পুস্তকের ২৫ ও তার পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। আমি তা উদ্ধৃত করলাম, যেহেতু তা এই বিষয়ে সলফের মানহাজের সারনির্যাস।*

মহান আল্লাহ নিজ কিতাবে তাঁদের সৌরভময় প্রশংসা করেছেন। সুতরাং তাঁদের মর্যাদা ও জিহাদের কথা এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল ব্যয় করার কথা বলেছেন।

তাঁর রসূল ﷺ-ও তাঁদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সৌরভময় প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মহত্ত্ব ও মর্যাদার ব্যাপারে ইসলামের ইমামগণ যত্ন নিয়ে সে বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে গালাগালি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

((لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ)).

"আমার সাহাবাকে গালি দিয়ো না। যেহেতু যাঁর হাতে আমার জান আছে তাঁর কসম! যদি তোমাদের কেউ উহুদ পর্বতসম স্বর্ণ ব্যয় করে, তবুও তা তাদের কারো মুদ্দ্ (৬২৫ গ্রাম) বরং অর্ধমুদ্দ্ পরিমাপেও পৌঁছবে না।" *(বুখারী ৩৬৭৩, মুসলিম ৬৬৫২নং)*

তাঁদের যথার্থ কদর করেছেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ। সুতরাং তাঁরা সার্বিকভাবে তাঁদের মর্যাদার হিফাযত করেছেন। আলী ও মুআবিয়া এবং তাঁদের অবশিষ্ট সঙ্গীদের মাঝে যা কিছু ঘটেছে, সে ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করতে তাঁরা নিষেধ করেছেন। আহলুস সুন্নাহ তাঁদের ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের সওয়াব সাব্যস্ত করেছেন। (অর্থাৎ, তাঁরা ভুল করলেও একটি সওয়াব পাবেন।) আর যে ব্যক্তি তাঁদের অথবা তাঁদের কোন একজনের সমালোচনা করবে, আহলুস সুন্নাহ তাকে বক্র ও ভ্রষ্টপথ অবলম্বনকারী নাস্তিক গণ্য করেছেন।

(গ) নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসারী তাবেঈগণ, যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীর সাহচর্য পেয়েছেন, তাঁদের আদর্শ গ্রহণ করেছেন, যেমন মদীনার সাতজন ফকীহ এবং সকল দেশে যাঁরা তাঁদের মানহাজে চলমান, (তাঁরা সম্মানের পাত্র)। অতঃপর তাঁদের পর হাদীস, ফিক্হ ও তফসীরের ইমামগণ, যাঁরা আকীদার ক্ষেত্রে, কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে, বিদআতী ও প্রবৃত্তিপূজারীদের নিকট থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে, হক ও হকপন্থীদের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত এবং এর পরেও আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) আসা অবধি সম্মানীয় সাহাবা ও তাবেঈগণের মানহাজে চলমান (তাঁরাও শ্রদ্ধার পাত্র)। তাঁদের প্রসঙ্গেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)).

"চিরকালের জন্য আমার উম্মতের একটি দল (হকের উপর) সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে, কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে উপেক্ষাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" *(আহমাদ ১৫৫৯৭, তিরমিযী ২১৯২, ইবনে মাজাহ ৬নং)*

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ তাঁদের মতো ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে বলেছেন, 'যাঁর নিকট থেকে গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদ বিদিত, তাঁর কথা নিন্দনীয় অথবা পাপী হিসাবে উল্লেখ করা বৈধ নয়। যেহেতু আল্লাহ তাঁর ভুল ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন। বরং যেহেতু তাঁর মধ্যে ঈমান ও তাক্বওয়া আছে, সেহেতু ওয়াজেব হল তাঁর সাথে বন্ধুত্ব গড়া, তাঁকে ভালোবাসা, তাঁর ক্ষেত্রে প্রশংসা, দুআ ইত্যাদির যে হকসমূহ আল্লাহ ওয়াজেব করেছেন, তা আদায় করা।[১১২]

দ্বিতীয়তঃ কাদের সমালোচনা ও দোষ উল্লেখ করা এবং তাদের ক্ষতি সম্বন্ধে লোকেদেরকে সাবধান করা যাবে

(ক) বিদআতীদের সমালোচনা করা এবং তাদের সম্বন্ধে লোকেদেরকে সতর্ক করা জায়েয; বরং ওয়াজেব। চাহে তাদের কেউ ব্যক্তি হোক অথবা জামাআত, গত হয়ে গেছে অথবা বর্তমান আছে, যেমন খাওয়ারিজ, জাহমিয়্যাহ, মুর্জিয়াহ, কার্রামিয়্যাহ এবং আহলুল কালাম, যাদের কালাম (ধার্মিক তত্ত্ব) নষ্ট আকীদার দিয়ে টেনে নিয়ে যায়, যেমন আল্লাহর সিফাতসমূহ অথবা কিছু সিফাতকে নিষ্ক্রিয় করা। এদের সকলের ব্যাপারে এবং এদের গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে (মানুষকে) সাবধান করা ওয়াজেব। তদনুরূপ সম্প্রতিকালে যে সকল ফির্কা (বা জামাআত) তাদের মানহাজে চলমান, যারা আহলুত তাওহীদ ও সুন্নাহ থেকে দূরত্ব বজায় রাখে, তাঁদের বিরোধিতা করে, তাঁদের মানহাজকে এড়িয়ে চলে, বরং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাঁদের মানহাজ ও তাতে চলমান ব্যক্তিবর্গকে ঘৃণা করে, তাদের ব্যাপারেও মানুষকে সাবধান করা ওয়াজেব। আর তাদেরই দলভুক্ত তারা, যারা তাদের সাহায্য করে, তাদের প্রতিরক্ষা করে, তাদের সদ্‌গুণাবলী উল্লেখ করে এবং তাদের সুকৃতিকে, তাদের ব্যক্তিত্বকে ও তাদের

---

(১১২) *মাজমূউল ফাতাওয়া ২৮/২৩৪*

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে 'মহান' রূপে প্রচার করে।[১১৩] কখনো তারা তাদের মানহাজকে আহলুত তাওহীদ, ওয়াস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মানহাজের উপর অগ্রাধিকার দেয়।

(খ) বর্ণনাকারী ও সাক্ষী যদি (কোন দোষে) দুষ্ট হয়, তাহলে মুসলিমদের ঐক্যমতে তাদের দোষ বর্ণনা করা বৈধ; বরং ওয়াজেব। এ কথা বলেছেন ও উদ্ধৃত করেছেন নাওয়াবী, ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুমাল্লাহু)।[১১৪]

ইসলামের ইমামগণ যখন দ্বীনের সাহায্যে এই কাজ সম্পাদন করেছেন, যার মধ্যে একটি হল বিদআতীর খন্ডন করা, অনুসন্ধানী দেখতে পাবেন, তাঁরা বিদআতীদের ও বর্ণনকারীদের সমালোচনা করেছেন এবং তাঁরা তাদের সদ্‌গুণ ও বদগুণের তুলনার কথার প্রতি ইঙ্গিতও করেননি।

তাঁরা দোষগুণ বিচারের (আল-জার্হু ওয়াত-তা'দীলের) গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন। রচনা করেছেন সুন্নাহর সাহায্যকল্পে এবং বিদআতী ও তাদের ফির্কাসমূহ নিয়ে গ্রন্থাবলী। রচনা করেছেন জাল হাদীস নিয়ে গ্রন্থাবলী। কোথাও তাঁরা এই ভালো-মন্দের তুলনার কথা ওয়াজেব বলে উল্লেখ করেননি; না নিকট থেকে, আর না দূর থেকে। বরং তাঁরা বিশেষ ক'রে দোষ উল্লেখের জন্য দুষ্ট বর্ণনাকারীদেরকে নিয়ে এবং কে তাদের দোষ বলে সমালোচনা করেছেন, তাকে নিয়ে গ্রন্থাবলীও রচনা করেছেন। কিন্তু নিকট থেকে অথবা দূর থেকে উক্ত শর্ত আরোপ করেননি।[১১৫]

সলফদের ইমামগণের গ্রন্থাবলীর পাঠক দেখতে পাবেন, তাঁরা বিদআত ও বিদআতীদের ব্যাপারে সাবধান করেছেন। আর এ কথা পাবেন না যে, তাঁরা বিদআতীর ভালো কাজ ও মন্দকাজ তথা বিদআতকে যুক্ত ক'রে ছাড়া ব্যাক্তিকে উল্লেখই করেননি। বরং তাঁরা কোন সুগুণ বা ভালোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ ছাড়াই সমালোচিত গ্রন্থ, জামাআত বা ব্যক্তির দোষরাজিকে উল্লেখ করেছেন।

---

(১১৩) *এ হল তখনকার কথা, যখন তাদের অবস্থা এবং তাদের নিকট সুন্নাহ-বিরোধী বিষয়াবলী জানা যাবে।*

(১১৪) *দ্রঃ মাজমূউল ফাতাওয়া ২৮/২৩৪*

(১১৫) *দ্রঃ মানহাজু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআতি ফী নাক্বদির রিজালি ওয়াল কুতুবি ওয়াত ত্বাওয়াইফ ৩২পৃঃ, লেখক এ ব্যাপারে উদাহরণও উল্লেখ করেছেন। যেমন দেখুন ঃ ৩৩-৩৪পৃঃ*

দেখুন, যা লিখেছেন ইমাম আহমাদ ও তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ। যা লিখেছেন বুখারী 'খালক্ব আফআলিল ইবাদ' গ্রন্থে। যা লিখেছেন খাল্লাল, ইবনে খুযাইমাহ সুন্নাহ ও তাওহীদের গ্রন্থাবলীতে।

যা লিখেছেন ইবনে বাত্ত্বাহ শারহ ও ইবানাহ গ্রন্থে, লালকাঈর শারহু ই'তিক্বাদি উসূলিস সুন্নাহ গ্রন্থে, বাগাবীর মুক্বাদ্দামাতু শারহিস সুন্নাহ ও মুক্বাদ্দামাতু ইবনি মাজাহতে, আবূ দাউদের সুনান গ্রন্থে, আবুল ক্বাসেম তাইমী আসবাহানীর আল-হুজ্জাতু ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ গ্রন্থে।

আরো দেখুন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনুল ক্বাইয়্যিম, ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের গ্রন্থাবলী এবং বিদআতীদের ব্যাপারে তাঁদের অবস্থান, তাদের বিরুদ্ধে তাঁদের আচরণও লক্ষ্য করুন।[১১৬]

আমি (লেখক) বলি, সলফের উলামাগণ বিদআতী ফির্কাসমূহের খন্ডন করেছেন। তাঁরা রাওয়াফিয, ক্বাদারিয়্যাহ, জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলাহ, খাওয়ারিজ, মুর্জিয়াহ, আশায়েরাহ, মাতুরীদিয়্যাহ ও সুফীবাদের খন্ডন করেছেন। অনুরূপ বিদআতীদের প্রধানদের; যেমন জাহম বিন সাফওয়ান, বিশ্র মুরাইসী, ইবনুল মুত্বাহ্হির হালী, রাযী, ইবনে আরাবী প্রভৃতির খন্ডন করেছেন। তদনুরূপ তাঁরা খন্ডন করেছেন আমেদী, গাযালী, বাকরী, ইখনায়ী, সুবকী প্রভৃতির।

বর্তমান যুগের সালাফী উলামাগণ বিদআতী ফির্কাসমূহ এবং বিদআত ও ভ্রষ্টতার প্রধানদের খন্ডনে তাঁদের সলফে সালেহর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তাঁরাও সুফীবাদী ফির্কা ও অধুনা রাজনৈতিক (ইসলামী) জামাআতসমূহের খন্ডন করেছেন,[১১৭] যে জামাআতগুলি নবী ﷺ-এর আদর্শ ও তাঁর

---

(১১৬) *প্রাগুক্ত ৭০পৃঃ*

(১১৭) *যে জামাআতগুলি দাওয়াতে এমন সব মানহাজ অবলম্বন করেছে, যার উপর সলফে সালেহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তার বিরোধী। উক্ত জামাআতগুলির মধ্যে একটি হল সেই জামাআত, যে তার প্রসিদ্ধ নীতির মাধ্যমে পরিচিত, 'যে বিষয়ে আমরা একমত, সে বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা করব। আর যে বিষয়ে আমরা ভিন্নমত, সে বিষয়ে একে অপরের জন্য ওজর পেশ করব (ক্ষমা ক'রে দেব)।' এই নীতির ভিত্তিতে এ দলের ভয়ানক জমায়েতী মানহাজ হল এমন (ফির্কা-নিরপেক্ষ), যার পতাকাতলে প্রত্যেক সেই ব্যক্তি শামিল হতে পারে, যে তাদের নীতিতে সম্মত। যে সাংগঠনিক নীতির পরিণামে বহু ভ্রষ্ট ফির্কা সেই দলে শামিল হয়েছে। যেখানে সূফীবাদী, রাফেযী (শীয়ী), (আল্লাহর সিফাতের)*

সাহাবীবর্গের আদর্শের বিরোধী। তাঁরা দ্বীনে-ইসলামের সাহায্যার্থে জেনে-বুঝে খন্ডন করেছেন প্রত্যেক সেই ব্যক্তির, যে সুন্নাহ ও সলফে সালেহর আদর্শের অল্প-বিস্তর বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

বর্তমান যুগের উক্ত সালাফী উলামাগণ, যাঁরা সাম্প্রতিককালের বিদআতীদের গুরুদের খন্ডন করেছেন, তাঁরাই সঠিক মানহাজের উপর কায়েম আছেন। আর তা হল সমালোচিত ব্যক্তির ভালো-মন্দের মাঝে তুলনা না করা। এ বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দর যে বই রচিত হয়েছে এবং যে বইটি উলামাদের প্রশংসাপ্রাপ্ত হয়েছে, সেটি হল শায়খ আল্লামাহ ডঃ রাবী' বিন হাদী উমাইর আল-মাদখালীর 'মানহাজু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআতি ফী নাক্বদির রিজালি ওয়াল কুতুবি ওয়াত ত্বাওয়াইফ'। শায়খ রাবী' সমালোচনার যে মানহাজ উল্লেখ করেছেন, তা এ যুগের প্রধান প্রধান উলামা সমর্থন করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শায়খ আল্লামাহ ইমাম আব্দুল আযীয বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ), শায়খ আল্লামাহ নাসেরুদ্দীন আলবানী ও শায়খ আল্লামাহ সালেহ ফাওযান প্রমুখ।

সামাহাতুশ শায়খ আল্লামাহ আব্দুল আযীয বিন বাযকে নিম্নের এই প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'বিদআতীদের ও তাদের কিতাবসমূহের খন্ডন করার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মানহাজের ব্যাপারে প্রশ্ন, তাদের ভালো কাজ ও মন্দ কাজ উভয়ই উল্লেখ করা কি ওয়াজেব? নাকি কেবল মন্দ কাজ উল্লেখ করা যাবে?'

(বিন বায) রাহিমাহুল্লাহ উত্তরে বলেছিলেন, 'আহলুল ইলমের বক্তব্যে বিদিত হল মন্দকাজের খন্ডন করা (মানুষকে) সাবধান করার জন্য এবং তারা

নিষ্ক্রিয়কারী, উপমা নির্ধারণকারী, মাযারীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। বরং তারা খ্রিস্টানদেরকেও তাদের দলে প্রবেশাধিকার দিয়েছে এবং আকীদায় ত্যাগ স্বীকার ক'রে ইয়াহুদীদের সাথে উদারনীতি প্রয়োগ করেছে! এমনকি তাদের একাধিক দলনেতা বলেছে, 'ইয়াহুদীদের সাথে আমাদের শত্রুতা দ্বীন-বিষয়ক নয়!' এই দাওয়াত থেকে জন্ম নিয়ে তার ছায়ায় চলমান হয়েছে শীয়া-সুন্নীর মাঝে সমন্বয়ের দাওয়াত। অতঃপর সকল ধর্মের মাঝে সমন্বয় সাধনের চিন্তাধারা। এ ছাড়া আরো অন্যান্য দাওয়াত রয়েছে, যা ইসলামে 'ওয়ালা ও বারা'র নীতি ধ্বংস ক'রে ফেলে। উক্ত জামাআত থেকে আরো অন্যান্য উপজামাআত সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে কোনটি হল চরমপন্থী খাওয়ারিজদের মানহাজে তাকফীরবাদী। আবার কোনটি হল অত্যন্ত নরমপন্থী আকীদায় মুর্জিয়াদের সহমতাবলম্বী।

যে ভুল করেছে, তা বয়ান করা তার থেকে সতর্ক করার জন্য। পক্ষান্তরে ভালো কাজ বিদিত যে, তা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু উদ্দেশ্য হল তাদের ভুল থেকে (মানুষকে) সাবধান করা, জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলাহ, রাফেযাহ প্রভৃতি অনুরূপ ফির্কার ভুল থেকে সাবধান করা। এবার যদি তাদের নিকট যে হক আছে, তা বয়ান করার প্রয়োজন হয়, যখন কোন জিজ্ঞাসক জিজ্ঞাসা করে, 'তাদের নিকট হক কী আছে? কোন্ বিষয়ে তারা আহলুস সুন্নাহর সমমতাবলম্বী?' আর জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি তা জানে, তাহলে সে তা বয়ান করবে। কিন্তু বৃহত্তর উদ্দেশ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তাদের নিকট বাতিল কী আছে, তা বয়ান করা, যাতে জিজ্ঞাসক সতর্ক হতে পারে এবং যাতে সে তাদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়।'

এরই মধ্যে অন্য এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, 'কিছু লোক আছে, যারা ভারসাম্য বজায় রাখার কথা বলে। আপনি যখন কোন বিদআতীর বিদআতের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করার জন্য তার খন্ডন করবেন, তখন তার ভালো দিকগুলিও উল্লেখ করা ওয়াজেব। যাতে আপনি তার প্রতি যুলুম না ক'রে বসেন।'

শায়খ (রাহিমাল্লাহ) উত্তরে বললেন, 'না, তা জরুরী নয়। তা আবশ্যক নয়। কারণ যখন তুমি আহলে সুন্নাহর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করবে, তখন দেখতে পাবে, উদ্দেশ্য হল সতর্কীকরণ। বুখারীর কিতাব 'খালক্বু আফআলিল ইবাদ', সহীহতে কিতাবুল আদাব পড়, আব্দুল্লাহ বিন আহমাদের 'কিতাবুস সুন্নাহ' ও ইবনে খুযাইমার 'কিতাবুত তাওহীদ' পড় এবং উষমান বিন সাঈদ দারেমীর বিদআতীদের খন্ডন ইত্যাদি পড়। (দেখবে) তাঁরা (সমালোচিত ব্যক্তিবর্গের মন্দ দিকগুলিকে) তাদের বাতিল থেকে (মানুষকে) সাবধান করার জন্য উদ্ধৃত করেছেন। উদ্দেশ্য তাদের সুকৃতি গণনা করা নয়।---উদ্দেশ্য তাদের বাতিলের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করা। আর যে কাফের হয়ে যায়, তার সুকৃতির কোন মূল্য নেই। যদি সেই বিদআতীর বিদআত তাকে কাফের বানিয়ে ফেলে, তাহলে তার পুণ্যরাজি পন্ড হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি তা তাকে কাফের না বানায়, তাহলে সে বিশাল বিপদের উপর দন্ডায়মান থাকে। সুতরাং উদ্দেশ্য হল, সেই ভুল-ভ্রান্তির উল্লেখ করা, যা থেকে (মানুষকে) সাবধান করা হয়।[১১৮]

([১১৮]) *দ্রঃ আন-নাস্‌রুল আযীযের ভূমিকা ৮পৃঃ, যা রের্কডকৃত শায়খের এক দর্স থেকে উদ্ধৃত, যা তিনি ১৪১৩ হিজরীর গ্রীষ্মে তায়েফ শহরে পেশ করেছিলেন। পরন্তু সামাহাতুশ শায়খ (রাহিমাহুল্লাহ)র কিতাবসমূহ বিদআতী এবং নানা ফির্কার খন্ডনে ভরপুর। যেমন*

শায়খ আল্লামাহ সালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ)কে বিভিন্ন জামাআত বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করার পর নিম্নের প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'শায়খ! তাদের ব্যাপারে (মানুষকে) সতর্ক করব তাদের ভালোর দিক উল্লেখ না করেই? নাকি তাদের ভালো ও মন্দ উভয় দিকই উল্লেখ করব?'

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'যদি তুমি তাদের ভালোর দিক উল্লেখ কর, তাহলে তার মানে হয়, তুমি তাদের জন্য আহবান করলে। না, তাদের ভালোর দিক উল্লেখ করো না। কেবল তারা যে ভুলের উপর আছে, সেই ভুলটা উল্লেখ করো। কারণ তোমাকে সে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি যে, তুমি তাদের অবস্থা বিচার-বিবেচনা করবে এবং তাদের ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন করবে। তোমার দায়িত্ব হল, যে ভুল তাদের আছে, তা বয়ান করা, যাতে তারা তা হতে তওবা করে। যাতে তারা ছাড়া অন্যেরা সে ভুল থেকে সতর্ক হতে পারে। কিন্তু তুমি যদি তাদের ভালোর দিক উল্লেখ করো, তাহলে তারা বলবে, 'এটাই তো আমরা চাই।'[১১৯]

ফাযীলাতুশ শায়খ আব্দুল আযীয আল-মুহাম্মাদ আস-সালমান (রাহিমাহুল্লাহ)কে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'সলফের মানহাজে বিদআতীদের খন্ডন করার ক্ষেত্রে কি তাদের ভালো-মন্দের ভারসাম্য রক্ষা করা শর্ত?

শায়খ (রাহিমাহুল্লাহ) উত্তরে বলেছিলেন, 'আল্লাহ আমাদেরকে, তোমাকে ও সকল মুসলিমদেরকে তওফীক দান করুন---জেনে রেখো যে, সাহাবা, তাবেঈন এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুগামিগণ সলফে সালেহ থেকে এ কথা বর্ণিত হয়নি যে, তাঁরা কোন এমন ব্যক্তিবর্গের সম্মান করতেন, যারা বিদআতী, যারা

'আত্-তাহযীর মিনাল বিদা', 'আর্রাদ্দু আলাল ক্বাউমিয়্যাতিল আরাবিয়্যাহ' এবং আরো অনেক খন্ডনের লেখা, যাতে তিনি জন্মদিবস ও জাহেলী ঈদসমূহ পালনের আহবায়কদের এবং নানা (বাতিল) ফির্কার খন্ডন করেছেন। সে সবের মধ্যে আপনি এই ভালোমন্দের ভারসাম্য রক্ষার কোন কথাই পাবেন না, যার প্রতি কিছু লোকে আহবান করছে। এই মানহাজ, যা শায়খ ইবনে বায (রাহিমাহুল্লাহ) অবলম্বন করেছিলেন, তাই গ্রহণ করেছেন শায়খ আল্লামাহ সালেহ ফাওযান তাঁর খন্ডন ও তার্কিক আলোচনাসমূহে। অনুরূপভাবে এ দেশের অন্যান্য উলামাগণ সলফের উলামাগণের (রাহিমাহুমুল্লাহু তাআলা) অনুসরণে উক্ত মানহাজ এখতিয়ার করেছেন।

(১১৯) *আন-নাস্রুল আযীযের ভূমিকা ৮-পৃঃ, যা রের্কডকৃত শায়খের কিতাবুত তাওহীদের দর্সসমূহের মধ্যে তৃতীয় দর্স থেকে উদ্ধৃত, যা তিনি ১৪১৩ হিজরীর গ্রীষ্মে তায়েফ শহরে পেশ করেছিলেন।*

বিদআতীদের দোসর এবং যারা তাদের দোসর হতে আহবানকারী। কারণ, বিদআতীরা হৃদয়ের রোগী। আর আশঙ্কা হয় যে, যে ব্যক্তি তাদের সাথে মেলামেশা করবে অথবা তাদের সাথে যোগাযোগ রাখবে, তার কাছেও তাদের ঐ দুরারোগ্য রোগ পৌঁছে যাবে। যেহেতু সংক্রামক রোগের রোগী সুস্থ ব্যক্তিকে সংক্রামিত করতে পারে, এর বিপরীত নয়। সুতরাং সাবধান! সতর্ক হও সকল বিদআতী থেকে। আর যে বিদআতী সকল থেকে দূরত্ব বজায় রাখা ও যাদেরকে বর্জন করা ওয়াজেব, তাদের মধ্যে আছে জাহমিয়্যাহ, রাফেযাহ (শীআহ), মু'তাযিলাহ, মাতুরীদিয়্যাহ, খাওয়ারিজ, সূফিয়াহ (সূফীবাদী), আশায়েরাহ এবং তারা, যারা সলফের পথ বর্জন ক'রে তাদের ভ্রান্ত পথের পথিক।

বলা বাহুল্য, মুসলিমদের উচিত, তাদের থেকে সাবধান থাকা এবং (অপরকে) সাবধান করা।'[১২০]

শায়খ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ)কে উক্ত ভালো-মন্দের ভারসাম্য বজায় রাখার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তার বিরোধিতা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর এক বক্তব্যে বলেন, 'তারা কোথায় পেয়েছে যে, যখন কোন মুসলিমের ভুল বয়ান করার সময় হবে, তখন ব্যক্তি দাঈ হোক অথবা অন্য কেউ, তার জন্য আবশ্যক হবে এমন এক বক্তব্য দেওয়ার, যাতে সে তার ভালোর দিকগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করবে? আল্লাহু আকবার! আশ্চর্যের বিষয়।'[১২১]

পূর্ববর্তী ও সাম্প্রতিক কালের সলফের উলামার পূর্বোক্ত উক্তিসমূহ থেকে স্পষ্ট হল যে, বাতিলপন্থীদের খন্ডনকালে তাদের ভালো-মন্দের ভারসাম্য রক্ষা করা সলফের মানহাজ নয়। উপরন্তু তাদের ঐ মানহাজ, অর্থাৎ সমালোচনাকালে সমালোচিত ব্যক্তির সুকৃতি-কুকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার মানহাজ বহু বড় বড় ভয়ানক ক্ষতির দিকে ঠেলে দেবে। যার গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় ক্ষতি নিম্নরূপ ঃ-

এক ঃ সলফকে অজ্ঞ মনে করা।

দুই ঃ তাঁদের প্রতি অন্যায় ও যুল্‌ম আরোপ করা।

---

(১২০) *আন-নাসরুল আযীযের ভূমিকা ১২পৃঃ*

(১২১) *মিন আজবিবাতিল আলবানী আলা আসইলাতি আবিল হাসান আদ্‌-দাআবিয়্যাহ*

তিন ঃ বিদআত ও বিদআতীর সম্মান করা এবং সলফের ইমামগণ এবং তাঁরা যে সুন্নাহ ও হকের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাকে তুচ্ছজ্ঞান করা।[১২২]

তারপর দৃষ্টি-আকর্ষী বিষয় হল, ভালো-মন্দের ভারসাম্য রক্ষা নীতির আহবায়করা এই বাতিল মানহাজে চলমান হওয়া এবং বিদআত ও বিদআতীদেরকে সুশোভিত ও জেল্লাদার করা সত্ত্বেও, 'তারা নিজেরা উক্ত মানহাজকে বর্তমানকালের সলফে কিরামের পথে চলমান আহলুস সুন্নাহর উপর প্রয়োগ করে না। বরং তারা অন্যায়ভাবে বিদ্বেষবশতঃ তাঁদের প্রতি অন্যায্যতা ও অনৈতিকতার অপবাদ আরোপ করে এবং সারা পৃথিবীতে তা সম্প্রচার ক'রে থাকে। আর তারা এ সব ক'রে বিদআতীদেরকে জয়যুক্ত করার জন্য এবং তাদের ওকালতি করার জন্য। যার ফলে মিসকীনরা নিজেদের অজান্তে আল্লাহর পথে ও সলফের মানহাজে বাধা প্রদানের কর্দমে পতিত হয়। অনুরূপভাবে অনুভূতি রেখে অথবা না রেখে বাতিল ও বিদআতের দিকে দাওয়াতের কর্দমে পতিত হয়।'[১২৩]

১২। ইসলামের উলামার নিকট যে সকল ক্ষেত্রে গীবত ও দোষবর্ণন বৈধ

নাওয়াবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'জেনে রাখো যে, সঠিক শরয়ী উদ্দেশ্যে (সেই) গীবত করা বৈধ, যে গীবত ছাড়া সেই উদ্দেশ্যে পৌঁছনো সম্ভব নয়। আর তার রয়েছে ৬টি দরজা ঃ-

এক ঃ যুল্‌ম ও অত্যাচারের শিকার হলে তার অভিযোগ করতে।

দুই ঃ মন্দের পরিবর্তন ঘটানো ও অবাধ্যাচারীকে সঠিকতার দিকে ফিরানোর জন্য সাহায্য নিতে।

তিন ঃ ফতোয়া জানতে।

চার ঃ মন্দ থেকে মুসলিমদেরকে সাবধান করতে এবং তাদেরকে নসীহত করতে।

পাঁচ ঃ ব্যক্তি তার পাপাচার ও বিদআত প্রকাশকারী হলে।

---

(১২২) *দ্রঃ আল-মাহাজ্জাতুল বাইযা' ফী হিমায়াতিস সুন্নাতিল গার্রা', ফযীলাতুশ শায়খ রাবী' আল-মাদখালী ১২৭পৃঃ*

(১২৩) *শায়খ আল্লামাহ রাবী'র বক্তব্য থেকে, দ্রঃ আল-মাহাজ্জাতুল বাইযা' ৩১পৃঃ*

ছয় ঃ পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি কোন এক (খারাপ) উপাধি দ্বারা পরিচিত বা প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে, যেমন অন্ধ, খোঁড়া, কালা ইত্যাদি, তাহলে এ কথা বলে পরিচয় দেওয়া বৈধ।'

অতঃপর তিনি বলেছেন, 'গীবত বৈধতার) এই ৬টি দরজার কথা উলামাগণ উল্লেখ করেছেন। এ সবের অধিকাংশই সর্ববাদিসম্মত। সহীহ হাদীস থেকে এর বিভিন্ন দলীলও প্রসিদ্ধ।[১২৪]

কোন কোন আলেম উক্ত ৬ প্রকার বৈধ দরজা বা ক্ষেত্রকে ছন্দরূপ দান ক'রে বলেছেন,

القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر

ومجاهر فسقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر.

বিদআতীর গীবত বৈধ হওয়ার শর্তাবলী

আমি (লেখক) বলি, বিদআতীর গীবত বৈধ হওয়ার জন্য শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ দুটি শর্ত আরোপ করেছেন ঃ-

এক ঃ ইল্‌ম বা জ্ঞান।

দুই ঃ নেক নিয়ত বা ভালো উদ্দেশ্য।

শায়খ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'তারপর এ কথা সজ্ঞানে বলার সাথে বক্তার জন্য নেক নিয়ত আবশ্যক। সুতরাং সে যদি হক বলে, যার উদ্দেশ্য হয় পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ অথবা বিপর্যয় সৃষ্টি করা, তাহলে সে হবে সেই মুজাহিদের স্থানে, যে অন্ধ পক্ষপাতিত্ব ও লোক প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে সে যদি আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে তাঁর জন্য দ্বীনকে বিশুদ্ধ করার জন্য সমালোচনা করে, তাহলে সে আল্লাহর পথে মুজাহিদীন, নবীগণের ওয়ারিষ ও রসূলগণের খলীফাদের মধ্যে গণ্য হবে। আর এ বিষয়টি নবী ﷺ-এর বাণীর প্রতিকূল নয়, যেখানে তিনি বলেছেন, "তোমার ভাই যা অপছন্দ করে, তাই তার পশ্চাতে আলোচনা করা (হল গীবত)।"[১২৫]

---

(১২৪) *রিয়াযুস স্বালেহীন ৫১৯পৃঃ, সহীহুল আযকার ২/৮৩৪*

(১২৫) *মুসলিম ৬৭৫৮নং*

যেহেতু 'ভাই' হল মু'মিন। আর মু'মিনের ভাই যদি নিজ ঈমানে সত্যবাদী হয়, এই হককে সে অপছন্দ করবে না, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল পছন্দ করেন। যদিও তাতে তার বিরুদ্ধে বা তার আত্মীয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হয়, তবুও তার জন্য আবশ্যক ন্যায় বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেওয়া, যদিও তা নিজের অথবা পিতামাতা অথবা আত্মীয়ের বিরুদ্ধে হয়।[১২৬]

আর যখন সে এই হককে অপছন্দ করবে, তখন তার ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। আর তার ঈমান হ্রাস পাওয়ার পরিমাণে তার ভ্রাতৃত্বও হ্রাস পাবে। সুতরাং তখন যে দিক থেকে তার ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে, সে দিক থেকে তার অপছন্দনীয়তা গণ্য হবে না। যেহেতু তার সে জিনিসকে অপছন্দ করা, যে জিনিসকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল পছন্দ করেন, এটা জরুরী করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পছন্দকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

((وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ)) (التوبة : ٦٢)

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল হচ্ছেন বেশী হকদার (এই বিষয়ে) যে, তারা যেন তাঁকে সন্তুষ্ট করে; যদি তারা মু'মিন হয়ে থাকে।" (তাওবাহ ঃ ৬২)

শায়খ (রাহিমাহুল্লাহ)র কথার সমাপ্তি।[১২৭]

বিদআতীর সমর্থকের শাস্তি

শায়খ বাক্র আবূ যায়দ 'হাজরুল মুবতাদি' পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠায় 'বিদআতীর সমর্থকের শাস্তি' শিরোনামে নবম আলোচনায় যা উল্লেখ করেছেন, তাই দিয়ে আমরা এই দর্স সমাপ্ত করব। শায়খ (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন, 'যেমন বাতিলের বক্তা সবাক্ শয়তান, তেমনি হক বলতে নীরব ব্যক্তিও বোবা শয়তান; যেমন বলেছেন আলী দাক্কাক্ব (মৃত্যু ৪০৬হিঃ) রাহিমাহুল্লাহ।

আর সহীহ হাদীসে নবী ﷺ-এর বাণী,

« الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ».

---

(১২৬) *(যেমন আল্লাহ সূরা নিসার ১৩৫নং আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন।)---অনুবাদক*

(১২৭) *মাজমূউল মাসাইল ওয়ার রাসাইল ৫/২৮১*

"যে যাকে ভালবাসে, (কিয়ামতে) সে তার সঙ্গী হবে।" *(বুখারী ৬১৬৯-৬১৭০, মুসলিম ৬৮৮৮নং)*

আনাস ﷺ বলেন, 'মুসলিমরা এই হাদীস শুনে খুশি হওয়ার মতো ইসলামের পর অন্য কোন বিষয়ে এত খুশি হয়নি।' *(আহমাদ ১২৭১৫, আবূ য়্যা'লা ৩২৭৮নং)*

ইমামগণ সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর আপত্তি জানিয়েছেন, যে ব্যক্তি আকীদার মৌলিকতা ভঙ্গ ক'রে বিদআতীদেরকে বর্জন করা ত্যাগ করে। (বরং তাদের সাথে সম্পর্ক কায়েম রাখে।)

ইত্তিহাদিয়্যাহর খন্ডনের সময়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'প্রত্যেক সেই ব্যক্তির শাস্তি হওয়া আবশ্যক, যে ব্যক্তি তাদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে অথবা তাদের প্রতিরক্ষা করে, (তাদের হয়ে সাফাই গায়) অথবা তাদের প্রশংসা করে অথবা তাদের গ্রন্থাবলীর তা'যীম করে অথবা তাদের সাহায্য-সহযোগিতায় পরিচিত হয় অথবা তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাকে অপছন্দ করে অথবা তাদের হয়ে ওজর পেশ করে যে, এ কথাটা কী তা জানা যায় না অথবা কে বলেছে যে, সে এই গ্রন্থ রচনা করেছে? এই শ্রেণীর অজুহাত, যা জাহেল অথবা মুনাফিক ছাড়া অন্য কেউ পেশ করে না। বরং প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া ওয়াজেব, যে তাদের অবস্থা জানে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সহযোগিতা করে না। যেহেতু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা বড় ওয়াজেব সমূহের অন্যতম। কারণ তারা বহু শায়খ, উলামা, বাদশা ও উমারাগণের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দ্বীন ধ্বংস করছে। তারা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ ক'রে বেড়াচ্ছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করছে।'[১২৮]

শায়খ বাক্র বলেন, 'আল্লাহ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহকে রহম করুন এবং জান্নাতের সালসাবীল ঝরনার পানি পান করান, আমীন। (তাঁর) এই বক্তব্য নিতান্ত সূক্ষ্ম এবং গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সে বক্তব্য 'ইত্তিহাদিয়্যাহ'কে সাহায্য সংক্রান্ত, তবুও তা সকল বিদআতীদেরকে সূত্রবদ্ধ করে। সুতরাং প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে কোন বিদআতীর পৃষ্ঠপোষকতা করবে, তাতে সে তার তা'যীম করবে, তার গ্রন্থরাজির তা'যীম করবে, সে সব মুসলিমদের মাঝে প্রচার

([১২৮]) *দ্রঃ মাজমূউল ফাতাওয়া ২/১৩২*

করবে, তাকে নিয়ে ও তার গ্রন্থরাজি নিয়ে গর্ব করবে, তাতে যে বিদআত ও ভ্রষ্টতা আছে, তা প্রচার করবে এবং তার মধ্যে আকীদায় যে বক্রতা ও ত্রুটি আছে, তা প্রকাশ করবে না। এমন যে করবে, সে তার কর্মে সীমালংঘনকারী। তার অনিষ্টকারিতা কর্তন করা ওয়াজেব, যাতে তা মুসলিমদের মাঝে সংক্রমণ না করে।

এ যুগে আমরা এই শ্রেণীর কিছু গোষ্ঠী দ্বারা মহাপরীক্ষায় পড়েছি, যারা বিদআতীদের সম্মান করে, তাদের বক্তব্য প্রচার করে এবং তাদের ভুল-ত্রুটি ও যে ভ্রষ্টতায় তারা আছে, তার ব্যাপারে (মানুষকে) সাবধান করে না। সুতরাং এই বিদআতী আবূ জাহ্ল থেকে আপনারা সতর্ক হন। আমরা দুর্ভাগ্য ও দুর্ভাগ্যবান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।'[১২৯]

(والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.)

সমাপ্ত

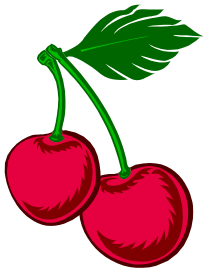

(১২৯) *হাজরুল মুবতাদি' বই থেকে ৪৮-৪৯পৃঃ*